ভারতের সাধনা

বিজয়কৃষ্ণ

ভারতের সাধনা

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যংগীয়তাং গীয়তাংমুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাঃ বিজয়চরিতামৃতং॥

শ্রীমণিভূষণ বাগচি
প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণলাল দে চৌধুরী
লিখিত পরিচয় সহ।

মডার্ণ বুক এজেন্সি,
১০নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
মডার্ণ বুক এজেন্সি,
১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন,
সখা প্রেস,
৩৪নং মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।

নিবেদন

কেহই—কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া—ইহা বলিতে পারেন না যে, তিনিই সব কথা বলিয়া গেলেন। মহতের জীবনীর শেষ নাই, দুইএকজনের লিখার ভিতর দিয়া তাঁহাদের কাহারও পরিচয় একেবারে নিঃশেষ হয় না। তাই আমার এই দুঃসাহস।

যে সব পুস্তক ও সাময়িক-পত্রিকার সাহায্যে আমি এই বই লিখিবার কয়েকটী উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহার মধ্যে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় সম্পাদিত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গর নাম অনেক দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ—বাঙ্‌লার ধর্ম্ম-সাহিত্যে এই বইখানির সমকক্ষ হইতে পারে, এমন বই খুব কমই আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিজয়কৃষ্ণের সব কথাগুলি যেন আজও আমরা ইহার ভিতর দিয়া স্পষ্টভাবেই শুনিতে পাই।

দ্বিতীয় কথা—ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। এই জন্যই এই বইখানির প্রতি আমি সমধিক আকৃষ্ট।

তৃতীয় কথা—১৯২৭ সনে এই বই লেখা সম্বন্ধে যখন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত পুরীতে আমার কথাবার্ত্তা হয়, তখন তিনি আমাকে এই গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"গোস্বামী মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনার

সমগ্র মর্ম্মকথা আজও জনসমাজে তেমন ভাবে ব্যক্ত হয় নাই; আমি মাত্র তাঁহার কথাগুলি 'নোট' করিয়া রাখিয়াছি।" তাই গোস্বামী মহাশয়ের আত্মকথার অধিকাংশই ব্রহ্মচারী-মহাশয়ের ডায়েরী হইতে লইয়াছি বলিয়া, তাঁহার অমর-স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অজস্র কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

এইরূপে মহাজনের পন্থার অনুসরণ করিয়া আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এই বইখানি লিখিলাম।

শ্রীমণিভূষণ বাগচি

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলে—

মামা!

একদা দৈব-দুর্ব্বিপাকে আপনার সংসারে 'পরগাছার' মতন আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছিলাম। আপনার স্বভাবসিদ্ধ মধুময় স্নেহগুণে, ক্রমে ক্রমে আমাকে একান্তভাবেই পরিজনভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আপনার বাৎসল্য-রসে পরিস্নাত হইয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছিলাম। তাই ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।

সুদীর্ঘকাল আপনার সান্নিধ্যে থাকিয়া, আপনার নির্ম্মল অন্তরে, সকলের অজ্ঞাতে, সদা নিঃশব্দ প্রবহমান সনাতন ধর্ম্মের যে শুদ্ধ ধারাটি, অপ্রতিহত বেগে, সর্ব্বকুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, সেই ভাগবতী ধারাটি যাহাতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় নিয়ত বহিয়া, সংসারে সকল কাজে আপনাকে নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত রাখিতে পারে, তাহার জন্য ভারতের সাধনা-কুঞ্জ হইতে দেবদুর্ল্লভ এই মহাপুরুষের জীবনী ও তত্ত্ব আপনাকে দিয়া ধন্য হইতে চাই কারণ,—

"তুলয়ামলবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

ইতি আপনার স্নেহ-ভিক্ষু

মণি।

ওঁ শ্রীহরি

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানুগ্রহকারিণে।
মায়ানির্ম্মিতবিশ্বায় মহেশায় নমো নমঃ
রোগা হরন্তি সততং প্রবলাঃ শরীরম্।
কামাদয়োঽপ্যনুদিনং প্রদহন্তি চিত্তম্।
মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্ দিনানি
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

ভূমিকা

বিজয়কৃষ্ণ পৈতেফেলা উৎকট ব্রাহ্ম ছিলেন, তারপর সাত নদীর জল এক ক'রে, আবার হ'লেন গোঁড়া হিন্দু; হিন্দু-সমাজের কাছে বোধ হয় তাঁহার এই টুকুই পরিচয়। কিন্তু তিনি ছিলেন কি, হ'লেন কি ও করলেন কি, এসব খোঁজ নেওয়ার বোধ হয় আমাদের ইচ্ছা নাই, অধিকার নাই ও শক্তি নাই। যাহারা খুব সরল সত্যপ্রিয় লোক, তাহারা অনেক সময়েই ঘরের ময়লা দেখিয়া, ঘর ছাড়িয়া, নূতন পথ সন্ধান করিয়াছে; কিন্তু তাহার মধ্যে ঘরের প্রতি কোন অবজ্ঞা নাই। তাহার সরল প্রাণ সব বিষয়ে খাপ খাওয়াইতে পারে না, সে উল্টোপাল্টা দেখে, তাই এসব গোলমাল ছাড়িয়া একেবারে ঋজু সত্যপথ অবলম্বন করে, তখনকার সত্যগুলি পোষন পালন করিয়া প্রচার করে। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকা চাই এক সত্য—ঘরই ছাড় আর পরই ধর। সেইখানেই বিদ্রোহ সার্থক যেখানে সত্য মিলে। বিজয়কৃষ্ণের এই অত্যাশ্চর্য্য রকম জীবনটা লোক তেমন করিয়া আলোচনা করিল না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়।

তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতেন, তখন বোধ হয় ভগবানের কথা, অনুসন্ধিৎসুর ভাষায় ও আবেগে বলিতেন। তাঁহার উক্তিতে অনেক যায়গায় পাওয়া যায়, ধর্ম্ম আর ভগবান এক, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের প্রগাঢ় চেষ্টায় তিনি যে ধর্ম্মলাভের

চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা তখন নিশ্চয়ই ভগবান্ হইয়া উঠে নাই। ধর্ম্ম আর ভগবান এক—এত বড় কথা বলিবার অধিকার যে মহাপুরুষদের থাকে বিজয়কৃষ্ণ সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ। আজ ধর্ম্ম ধোঁয়া হইয়াই জগত হইতে উবিয়া যাইতেছে; ধর্ম্মে কেহই শক্তি দেখে না, তেজ দেখে না, প্রেম দেখে না, ত্যাগ দেখে না, বৈরাগ্য দেখে না, তাই ওটা আবার কি—ওর কোন অস্তিত্ব নাই—বরং উহা সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কিন্তু তবে বিজয়কৃষ্ণ করিয়া গেলেন কি? তিনি যে আকাশগঙ্গার ধারে এগার দিন অজ্ঞান হইয়া গুরুদত্তমন্ত্র সাধনা করিলেন, আর সেই গুরুই বা তিনি কি কঠোর তপস্যায় লাভ করিয়াছিলেন, আর সেই গুরুলাভের প্রয়োজনীয়তাও যে তাঁহার সরল সত্য উদার আকুল প্রকৃতি শুনিবামাত্র বুঝিয়া লইয়াছিল এবং পাগলের ন্যায় খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল এ সকল কথা কি বিশ্বাসযোগ্য নহে? ইহার মধ্যে যে কি গূঢ় রহস্য রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা ত দূরে থাকুক—এই সকল কথা গুলিই হয়ত শিক্ষিত সাধারণের অনেকের শ্রুতিগোচরে পৌঁছায় নাই। এসব কথাত আমরা তাঁহার নিজ মুখ হইতেই শুনিয়াছি, এসবত কেহ রচিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য প্রচার করে নাই। আর এমন খুঁটীনাটি সহ গুরুসন্ধান ও গুরুকরণের বিবরণ, তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ছাড়া অন্যের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না; তবে এই সব তত্ত্ব এবং এই সব ঘটনার কি কোন মূল্য নাই? ভারতবর্ষ 'আমি আধ্যাত্মিক, আমি আধ্যাত্মিক' বলিয়া চেঁচাইয়া

মরে, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতা কি, তাহা যে কত বড় শক্তি, এবং সে শক্তি এখনও উপযুক্ত উপায়ে লাভ করা যায়, যাহা বিজয়কৃষ্ণ দেখাইয়া গেলেন, এ বিষয়ে কেহ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন মনে করে না।

ভগবানই এক সত্য,—তাঁহাকে না দেখিলে ইন্দ্রিয়েরও রস মরে না গীতায় এই কথা শুনিয়াছি। আর সেই সত্যের কোন সন্ধান না পাইয়া কেবল বাক্যের ঝুরি, শব্দের ঝুরি, আর কবিতার ঝুরি লইয়া থাকিলে কি সত্য মিলে? "কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে, কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে", তাই অনুভবের ধর্ম্ম ছাড়া, বক্তৃতা বা প্রচারের ধর্ম্ম স্থায়ী পসার জমাইতে পারেনা ও ধর্ম্মকে পঙ্গুই করিয়া দেয়। ভগবান সর্ব্বেষামপি গুরু, তাঁহার কাছ হইতেই সমস্ত গুরুপরম্পরায় বাহির হইয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা ভগবান্‌কে ধারণ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের উপদেশলাভ ভিন্ন, ভগবানকে বোঝা যায়না, চেনা যায়না, ধরা যায়না ও পাওয়া যায়না; অন্ততঃ বিজয়কৃষ্ণের কথায়, "সম্ভোগ করা যায়না ও সাহচর্য্য পাইয়া নিরাপদ হওয়া যায়না।" যার কার্য্য তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে; ধর্ম্ম চাও, যাহার কাছে ধর্ম্ম সত্য, স্বাভাবিক ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় জীবনধারণের বস্তু এই রকম একজনকে খুঁজিয়া বাহির কর। এইরূপ কাহারও কৃপা পাইলে তবেই তোমার ধর্ম্মপিপাসা মিটিতে পারে। নইলে "অন্ধেন নীয়মানো যথান্ধঃ" হইয়া, কেবল মিথ্যাই বাড়িয়া যায়।

বিজয়কৃষ্ণের কাছে পনর মিনিট বসিলেই তাঁহার স্থৈর্য্য ও মাধুর্য্যে অভিভূত হইতে হইত, তাহারপর তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, শক্তি সম্বন্ধে এবং জাগতিক বিষয় সম্বন্ধেও, যে সকল উপদেশ-ধারা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অন্ততঃ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের কিছু আভাষ আনিয়া দেয়। তাঁহার ভিতর যদি কিছু নাই থাকিত ও তিনি যাহা বলিতেন তাহা যদি ফাঁকা আওয়াজ হইত, তিনি সত্যবস্তু পাইয়াছেন বলিয়া যদি আগন্তুককে বিশ্বাসবান্ না করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি আনন্দমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সকলেই তাঁহার ধর্ম্মজীবন দেখিয়া নিজেদের একটা সমূহ ক্ষতি বোধ করেন? যদি তাঁর কাছে সেই সত্য আকর্ষণের বস্তু নাই থাকিত তাহা হইলে কি আর অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি স্বাধীন চিন্তাশীল লোক মহাজনের পদাবলী শুনিতে মজ্‌গুল হইয়া যান? তাঁহার কাছে সাচ্চা বস্তু দেখিয়াই ইহাঁরা তাঁহার চরণে লুটাইয়াছিলেন। তবে ইহাঁরা তাঁহার স্বরূপ, শক্তি, বৈশিষ্ট্য এবং কীর্ত্তি সাধারণে প্রচার করিয়া গেলেন না এই যা দুঃখ!

বিজয়কৃষ্ণকে বুঝিতে একজন বিজয়কৃষ্ণ হইতে হয়। কথার তুব্‌ড়ি ফুটাইয়া, একটা কিছু সাময়িক জ্বলুষ দাঁড় করানত শক্ত নয়, কিন্তু সেই বিজয়কৃষ্ণের আটান্ন বর্ষ ব্যাপী সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া দেখিয়া ত ভয়ে পিছাইয়া আসিতে হয়। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবে শিখাইলা" মহাপ্রভু যাহা আচরণ করিয়াছেন, যাহা শিখাইয়াছেন তাহা অন্যের মুখে শুনিতে হয়—তাও আবার অনেকদিন বাদে; কিন্তু ইনি ইহাঁর নিজের মুখে ইহাঁকে

ধর্ম্মসাধন করিতে কি বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং ধর্ম্মের সরল পথ কি তাহা সকলকে শুনাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ একেবারে ওয়াকিবহাল হইয়া যে ধর্ম্ম শিখাইয়াছেন, সেই ধর্ম্মের তত্ত্বে কেহ প্রবেশ করিতে চাহে না, কি দুঃখের বিষয় !

তবে এই টুকুই আশার কথা যে এখনও এই বিজয়কৃষ্ণতত্ত্ব-লেখকের মতন দু'চারজন এ বিষয়ে চর্চ্চা করে, এ বিষয়ের সংবাদ রাখে এবং এ বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইতে চায়। এ পথের পথিক চিরদিনই বিরল, তবুও ধর্ম্ম যে সত্যবস্তু, ভগবানকে যে লাভ করা যায়—ঋষিরা যাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন—এসকল কথা আজ অনেক স্থলে আলোচিত হইতেছে, সমাদৃত হইতেছে এবং কখনও কখনও কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে,—এইটাই আশার কথা।

"জনৈক ভক্ত"

পরিচায়িকা

সাহিত্য-সমাজে একেবারে অপরিচিত বলে, বন্ধুবর ভার দিয়েছেন তাঁকে ও সেই সঙ্গে তাঁর এই বইখানাকে সকলের কাছে পরিচিত ক'রে দেবার জন্যে। কিন্তু, বাংলা দেশ থেকে ছশ' মাইল দূরে পড়ে থেকে আমিও যে তাঁরই মত অতি অপরিচিত, তাই এই পরিচয়পত্র লিখ্‌তে ব'সে ভাব্‌ছি, 'ইয়ং' সাহিত্যিকগণ (পাঠকগণত বটেই) কি চোখে আমাদের দেখ্‌বেন!

আবার বইও বেছে বেছে লিখেছেন তেম্‌নি ধরনের, নিছক নীরস সাধু লোকের একখানা মামুলি জীবনী! তাও যদি এক খানা চল্‌তি বাংলার হাল্কা 'রোমান্স' হোতো, কিম্বা ঐ রকম নাটক কি হাল ফ্যাসানের কবিতার বই হোতো, তা হলেও বা একটা কথা ছিল; এ যে একেবারে বেঢপ্‌, বেখাপ্পা জিনিষ! বন্ধুবরের দুঃসাহসের তারিফ্‌ত করিই, কিন্তু দেখ্‌ছি তারও বেশী দুঃসাহস দেখিয়েছেন শ্রদ্ধেয় উপেনদা' মডার্ণ বুক এজেন্সির পাব্লিসার হিসেবে এই জিনিষ ছাপিয়ে দশের সাম্‌নে বের ক'রে। 'মডার্ণ' যে আজ 'ওল্ড' (old) জিনিষের কদর বুঝ্‌তে শিখেচে, এই শুভ লক্ষণটুকু ভরসা করেই, গ্রন্থ ও তথা গ্রন্থকারের পরিচয় দু'চার কথায় বলে ফেলি।

গ্রন্থকার—শ্রীমণিভূষণ বাগ্‌চি; বাড়ী—নবদ্বীপ। খাঁটি চৈতন্যের দেশের লোক। আমরা দুজনে দুজনকে জানি অনেক দিন আগে হোতে। বিশেষ করে জানা শুনো হয় এই বই

লেখা নিয়ে। বছর পাঁচেক আগে তিনি এই ধরনের এই সব বই লিখ্‌বার কথা আমায় বলেন ও বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচ্য মহাপুরুষের জীবনী নিয়ে সে সময় আমাদের মধ্যে বেশ একটা আলোচনাও হয় ও তখন তাঁকে এই বই লেখা আরম্ভ করতে দেখেছিলাম। তারপর, আমি সে কথা এত দিন ভুলেই গিয়েছি, ও ভেবেছিলাম বন্ধুবরের মগজ থেকে সে সব খেয়াল 'বাষ্প' হয়ে গেছে; আজ দেখি, না, তা নয়; তিনি সত্য সত্যই সে বই সেই ভাবেই লিখেছেন। বইত সবাই লেখে, ইনিও লিখেছেন; এখন আমরা, অর্থাৎ পাঠকেরা তার খবরদারী করলে হয়!

এইবার গ্রন্থের কথা। বইখানা জীবনী হলেও, এমন নতুন 'ষ্টাইলে' লেখা, যে তা নভেলের চেয়েও সুখপাঠ্য ও সহজ-পাঠ্য বলে মনে হয়। সাহিত্যের ভেতর ধর্ম্মের কথা, একটা ভীতির জিনিষ, তার ওপর ধার্ম্মিক লোকের জীবনী, স্বভাবতঃই আমাদের বর্ত্তমান 'ডিসপেপটিক্' যুগে গুরুপাক না হয়ে যায়না, তাই যথাসম্ভব এগুলো আমরা এড়িয়ে ও পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করি। দোষ আমাদের যতটা না হোক্, তার বেশী হচ্ছে তাঁদের যাঁরা এই সব সাধু পুরুষের স্থূলভজীবনীলেখক। গ্রন্থকার, ভারতের সাধনার ভেতর দিয়ে বিজয়কৃষ্ণের জীবনী, অনাবশ্যক বাহুল্য বাদ দিয়ে, সহজপাচ্য করে লিখ্‌লেও, এর 'ভিটামিন প্রোডাক্ট' (vitamin product) বাদ দেন নি, তাই তাঁর লেখার মধ্যে subjective ও objective দুই দিক্‌ই বেশ এমন সহজ ভাবে ফুটে উঠেছে যার মধ্যে

লেখকের ব্যঞ্জনাশক্তি (suggestiveness) প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দেয় ;—'ষ্টাইলটা' নতুন এই জন্যেই।

জার্ম্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক 'ওল্ডেন্‌বার্গ' (Dr. Hermann Oldenberg) যে principle নিয়ে বুদ্ধের জীবনী খানা লিখেছেন সেটা হচ্ছে—"From the surface where each phenomenon presents itself as something different from every other, the speculative imagination strives to pierce into depth below, in which lies the unifying bond of all diversity. Man looks for the essence in things and the essence of the essence, for the reality, the truth of all phenomenon and the truth of the true. This quest of the substance is necessarily a search for unity in all diversity"—আর ঠিক এইটে standard করেই বন্ধুবর যা লিখেছেন, তা জীবনী ত বটেই, এ ছাড়া অনেক কিছু।

যে মহাপুরুষ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, তাঁর নতুন করে কি পরিচয় দেব, আর আমরা তাঁকে সত্যিকারের চিনিই বা কতটুকু ? মহাপুরুষের জীবনী লিখ্‌তে গিয়ে আমাদের দেশে লেখকেরা, সংসার ছেড়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে কি করে মহাত্মারা ভগবানকে পেয়েছেন, বেশীর ভাগ সেই কথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন ও তার সঙ্গে সামান্য রকমের দুই একটি স্থূল ঘটনা মাত্র লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু, ভগবান যাঁদের কাছে একটা পাওয়া জিনিষ

(achieved possession) আদতে সেই সব মহাত্মাদের জীবনের গূঢ়তম কথা হ'ল, মানসিক প্রকৃতি। মানসিক প্রকৃতি যাতে পাওয়া যায় না, তা জীবনী বলে বাজারে কাট্‌তি হ'লেও, জীবনী নয়, ভাটের কাহিনী মাত্র। তাই মহাপুরুষদের জীবনী কল্পিতকাহিনীভরা—এই একটা ভয়ানক অভিযোগ বন্ধুবর তুলেছেন। কথাটা ঠিকই। বাইরের ঘটনামাত্র দিয়ে কোন মহৎ জীবনের আসল পরিচয় দিতে যাওয়া যে কত দুঃসাধ্য, (গ্রন্থকারের কথায় 'ভাবের ঘরে চুরি করা') তা চিন্তাশীল লোক-মাত্রেই স্বীকার কর্ব্বেন। ব্যক্তিগত আচার ও আচরণের মধ্য দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনের কথা ও কাযের ভেতর দিয়ে বিজয়-কৃষ্ণকে দেখিতে ও দেখাইতে পারা যায় না, কোন মহাপুরুষকেই নয়। বিজয়কৃষ্ণ তাঁর তপস্যা ও অনুভূতির ভেতর দিয়ে তাঁর অন্তর্লোকের ভাবজীবনটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সেই আজীবনের সাধনায় সত্যলোকে যাত্রার ইতিহাসটি আপনা আপনি লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে। বাঙ্গালীর সম্মুখে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর দৈনিক জীবনের কাজ ও ব্যবহারমূলক পরিচয় নিয়ে দাঁড়ান্‌নি; আমাদের কাছে তাঁর যে পরিচয়, তাই যদি তাঁর সত্যকার পরিচয় হয়, তা হলে সে পরিচয় তাঁর অনুগত শিষ্য ও বন্ধুগণের কাছে বা তাঁদের লেখার মধ্যে পাব না, সে পরিচয় পাব আমরা তাঁর সাধনার অনুভূতিতে ও প্রেরণায়। তাই, এই নবীন গ্রন্থকার তাঁর আলোচ্য বইতে দেখিয়েছেন, সত্যের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য synthesis বজায় রেখে, বিজয়কৃষ্ণ কোন্ ভাবলোকের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন

ও সেখান হোতে ভবিষ্যত ভারতের জন্য গঠনমূলক কোন্ ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন

বিজয়কৃষ্ণের ভাবের একটা বিকাশ ও পরিণতি আছে। সে বিকাশ ও পরিণতিকে ফুলফোটার সঙ্গে তুলনা না করে, প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা কর্‌লেই বোধকরি ভাল হয়। কারণ, ফুলের সুরু হ'তে শেষ পর্য্যন্ত বিকাশের মধ্যে একই সৌন্দর্য্যের উন্মেষ দেখা যায়। প্রজাপতির তা নয়; এর জীবনের প্রথম অবস্থা ও তারপরের অবস্থায় এমন একটা বিষম বাহ্যিক অসমতা দেখা যায়, যাতে করে প্রজাপতির বিশেষ অবস্থা গুলোকে একই জীবনের ক্রমিক বিকাশ বল্‌তে বাধে। তেম্‌নি বিজয়কৃষ্ণের জীবনের দিক্ দিয়ে যে বিকাশটি অব্যাহত ভাবেই ঘটেছে, তাকে বাইরের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, বিচ্ছিন্ন এবং সামঞ্জস্যহীন বলেই মনে হবে ; কারণ প্রথম যুগের বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী ও সংস্কারসমর্থক এবং পরবর্ত্তী যুগের বিজয়কৃষ্ণ আনন্দ ও সত্যের বাণী বহনকারী। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে এই দুইটি অবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি, তা এই লেখক ভাল করেই দেখিয়েছেন বলেই তাঁর চিন্তা ও লেখা আগাগোড়া এমনভাবে টানাপড়েন বুন্‌তে বুন্‌তে চলেছে যে কোথাও তা এতটুকু পীড়াদায়ক হয়নি,—একথা আমি হলফ্ করে বল্‌তে পারি, মাত্র বন্ধু হিসেবে নয়, নিরপেক্ষ 'ক্রিটিক' হিসেবেও বটে।

তারপর বিজয়কৃষ্ণের জীবনে সুরু হতে শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের প্রতি যে মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ দেখ্‌তে পাই, আর

যে অপরিসীম রহস্যবোধ তাঁর অনুভূতির একটা বিশেষত্ব, তা এমন psychological determinism এর সঙ্গে লেখক বুঝিয়েছেন যাতে করে একথা বল্‌লে খুব বেশী বলা হয় না যে বাংলার এই বিরাট পুরুষের সত্যিকার পরিচয় হয়ত কোন কালে আমরা পেতুমনা, যদি না ভারতের সাধনার ভেতর দিয়ে বিজয়কৃষ্ণকে এই ভাবে জান্‌তে পারতুম। মোটকথা, এই জীবনীখানা 'হট্‌হাউস্‌প্ল্যাণ্ট্' (Hot-house plant) গোছের না হোয়ে, এটি হোয়ে উঠেছে যেন একটি 'লিডেন জার' (Leyden Jar), যার সংস্পর্শে একবার এলেই electrocute না হয়ে যাবার যো নেই।

সব শেষের শেষ কথাটি এই যে, ইনি জীবনী যতটা না লিখেছেন, তার বেশী দেখিয়েছেন, আলোচ্য মহাপুরুষের জীবনের নিগূঢ় সত্যটুকু, যা আমরা চাই, শুধু পড়বার ও জানবার খাতিরে নয়, মানুষ হয়ে গ'ড়ে উঠ্‌বার জন্য। যেহেতু, মেটারলিঙ্কের (Maurico Materlink) কথায়—"It is a proclamation of the necessity of truth and justice and beauty for the soul of man as well as for his physical condition. It is a crusade against shams and lies. It is a declaration of the ultimate good in every human soul and of the infinite possibilities of development. It is a gospel of courageous optimism of noble idealism inspite of every obstacle. It is a spiritualism as opposed to materialism, it is progress for man and

woman ; it is the development of all the intellectual faculties and of soul instinct above brain instinct.” লেখক বিজয়কৃষ্ণের জীবনী হোতে এই সত্যটুকু নিঙড়ে বের করেছেন এই ভেবে যে, মহা-পুরুষের প্রকৃত জীবনী জাতীয় সম্পত্তি, তাঁদের সাধনা জাতির ভবিষ্যৎপথ নির্দ্দেশক ; কোন সম্প্রদায় বিশেষের তাঁদের উপর monopoly থাক্‌তে পারে না, থাকা উচিতও নয়।

“ভারতে ধর্ম্মের রাজ্যেও খাঁটি জিনিষের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়া আর একবার দরকার হয়েছে—যত অপশাস্ত্র ও অপ-ধর্ম্মের আবর্জ্জনা ভাগাড়ে টেনে ফেলাবার আয়োজনে। মানুষের চোখ কাণ ফুটুক, মেকি ও খাঁটি চিনে নেবার সামর্থ্য হোক, সত্যপিপাসা ভারতের আবার হোক সরল ঋজু ও অনাবিল,”—মূলতঃ এই রকম ‘জেহাদ্’ ঘোষণা-করা সতেজ মন নিয়ে লেখা কবি-বন্ধুর এই কুমারী-প্রচেষ্টা সকল দিক্ দিয়ে সার্থক হোক্ ইহাই আমার মর্ম্ম-কামনা।

লাম্‌ডিং (আসাম)
শ্রাবণী-পূর্ণিমা
১৩৩৯

শ্রীকৃষ্ণলাল দে চৌধুরী।

প্রকাশকের নিবেদন

'ভূমিকা' ও 'পরিচয়ে' যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উপর প্রকাশকের বিশেষ কিছু বলিবার না থাকিলেও, প্রসঙ্গতঃ দুই একটি কথা বলা দরকার।

কোন সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষুণ্ণ করিয়া এই মহতের জীবনী রচিত হয় নাই, ভবিষ্যতেও যে সমস্ত মহাপুরুষ ও মহতী নারীর কাহিনী বাহির করিবার ইচ্ছা আছে তাহার ভিতরও আমরা আমাদের কথাই মাত্র বলিব। প্রয়োজন হইয়াছে আজ জাতির পক্ষে তাহার আপন ঘরের জিনিষের সত্য-সন্ধান লওয়া, তাহার ভারতকে খাঁটি ভারত বলিয়া চেনা। দেড়শত বর্ষব্যাপি বিদেশীয় শিক্ষার ভিতর দিয়া আজ যাহা পাইয়াছি, তাহা আমাদের মাত্র জড়বাদী ও সংশয়বাদী করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আরও অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষতি সাধন করিয়াছে ও এখনও করিবার স্পর্দ্ধা রাখে।

ভারতীয় সাধনার নিভৃত তপঃক্ষেত্র হইতে বিস্মৃত মহাপুরুষদের জীবনীগুলি আজ তাই একে একে নূতন করিয়া আহরণ করিবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে—জাতির ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজকে পশ্চিমের সর্ব্বগ্রাসী মোহ হইতে বাঁচাইবার জন্য। জাতির পক্ষ হইতে সাধুসঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ আমাদের দুঃসাহসের প্রথম অবদান এই বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া আরম্ভ হইল। ইতি—

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক।

প্রশস্তি

মুক্তি-পথের দিশারী গো ভক্তি-পথের গুরু
সাধন তরে আসন তব কোথা হোলো সুরু ?
গৃহ-উদাসী চির-সন্ন্যাসী কোথা আছ তুমি ?
কোথায় তুমি হে চির-প্রেমী ডাকে বঙ্গভূমি
আর্ত্তস্বরে ; অশ্রু ঝরে দুই নয়নে মাতার
অবিরাম হরিনাম গাহিবেনা কি আবার ?
অম্বু জিনি কম্বু-কণ্ঠ নীরব কেন গো আজ,
নীলাচলে লীলাছলে সহসা হানিলে বাজ ।
লুকালে সহসা, ঘন-বরষা নামিল বঙ্গে,
ভাব-লহরী ঘুরি ফিরি নৃত্য করিত অঙ্গে ।
যোগ-দৃষ্টি ভোগ-সৃষ্টি চির-বাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠে
ভক্ত-জন শ্রী-চরণ ধরি' কাতরে ঐ লুণ্ঠে ।
প্রেমিক ধন্য নব-চৈতন্য শান্তিপুর-প্রিয়,
দরশ তব পরশ তব সর্ব্বজনে দিও ।
সাধনা শেষ বাসনা লেশ ছিল না অন্তরে
শুদ্ধ সত্ত্ব বুদ্ধ নিত্য জপি প্রেমের মন্তরে ।
নিরবধি কি সমাধি লভিতে এ কোলাহলে ;
প্রসাদ জ্ঞানে আপন ধ্যানে ধর হলাহলে
শ্রী-কণ্ঠে তব নীলকণ্ঠমত ; জানিত কেহ
এই ভাবে তুমি যাবে পাশরি এ মর্ত্ত্য দেহ ?
সেই লীলা মনঃশীলা গাহিতে বাসনা হয়,
কোটী প্রাণ গাহে গান—"জয়তু বিজয় জয়"



শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

সূচনা

চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা-দ্বাদশীর এক অশ্রু-ম্লান সন্ধ্যায়, শ্রীক্ষেত্রে, নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে বাঙ্গালীর ভাব-সিদ্ধ যে আদর্শ বিগ্রহটি সমাহিত করা হইয়াছিল, তাহার অন্তর্গূঢ় সাধনার অভিনব তত্ত্ব, বুঝি সেই দিন সেই সঙ্গেই ভক্তগণের অন্ধভক্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল। তাই বাঙ্গালী সেদিন সন্ধান পায় নাই, নীলাচলে কোন 'গোরাচাঁদ' নূতন করিয়া অপ্রকট হইল। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার অব্যর্থ সঙ্কেত আমরা বুঝিবার অবকাশ পাইলাম না বলিয়াই, অতীতের প্রতি সুদূর প্রসারি দৃষ্টি রাখিয়া ঋষি অরবিন্দ পরম দুঃখে জাতিকে শুনাইলেন—"The truth of the future that Bijoy Goswami hid within himself, has not yet been revealed utterly to his disciples".

বিজয়কৃষ্ণকে যদি আমরা মাত্র তাঁহার কতিপয় শিষ্যবৃন্দের আরাধ্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম সেই সত্তাটিকে আজও অপ্রকট অবস্থায় লজ্জায় ম্রিয়মান হইতে হইবে; শুধু তাহাই নহে, জীবনাবধি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক যে উজ্জ্বল আদর্শের তিনি অনুশীলন করিয়াছিলেন ও সকল রকম দুঃখ কষ্ট, নির্য্যাতন সহিয়া, কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কঠোর সাধনায়, যে মহান আদর্শটিকে

স্বীয়-জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন ; এবং তাহাকে নূতন ছাঁদে ঢালিয়া একটী বিশিষ্ট রূপ দিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন—সেই আদর্শটিকে পর্য্যন্ত নিতান্ত অবহেলায় ক্ষুণ্ণ করা হইবে।

হইয়াছেও তাই। জাতির পরম দুর্ভাগ্য, তাহা নহিলে আজও সে দিব্য সত্ত্বাটির সন্ধানে কেহ ব্যগ্র হয় নাই ; শিষ্যগণ্ডীর সংকীর্ণ বেষ্টনীর ভিতর হইতে ভারতীয় সাধনার সেই শ্রেষ্ঠ রত্নটিকে বাহির করিবার দুঃসাহস কেহ পায় নাই। ধর্ম্মজীবনের সহিত, আমাদের সমাজ, সংসার ও রাষ্ট্রে কি বিচিত্র সম্বন্ধের কথা তিনি বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আজও আমরা বধীর।

আজ বুঝি সেই দিন আসিয়াছে। মুহ্যমান জাতির প্রাণে আশা ও চেতনার সঞ্চার করিবার জন্য, আজ আমাদের সকলের আগে দরকার সনাতনসাধনায় সিদ্ধ এই সব মহাপুরুষের জীবন-বেদ পাঠ করিবার। গতানুগতিক প্রথায় তাহা করিলে চলিবে না ; আমাদের নিত্যকার জীবনে, সংসারের সুখ দুঃখের মধ্যে তাঁহাদের প্রতি কথা ও প্রতি কার্য্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অবিচলিত শ্রদ্ধায় পালন করিতে হইবে। অমৃতের সন্তান তাঁহারা হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর আমরা, আমাদেরও তাহাই হইতে হইবে।

শুনিতে পাই, বিজয়কৃষ্ণ, তাঁহার জীবনী, অথবা সাধনতত্ত্ব বিষয়ে এমন কিছু উপাদান রাখিয়া যান নাই যাহা হইতে আমরা এই ভক্তবীরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী নিখুঁত আলেখ্য

আঁকিয়া, বর্ত্তমানে উন্মার্গগামী, আচার ও বিচারভ্রষ্ট এবং স্বধর্ম্মহীন, তাঁহার জাতির মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে পারি। জাগতিক উপাদান মহাপুরুষগণ কোনও কালে কোন দিন রাখিয়া যান নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের বিষয় সম্যক না জানিয়া, না বুঝিয়া লোকপরম্পরায় শ্রুত কতকগুলি কল্পিত-কাহিনী দিয়া এই সব যুগপুরুষগণের বিবরণ লোক-সমাজে প্রকাশ করা, কতদূর যে 'ভাবের ঘরে চুরি করা' হয়, তাহা বলা যায় না।

ধ্যানলব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মহাপুরুষগণের চরিত্র, সাধনা ও কার্য্যাবলির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সত্যের নিকষপাথরে সে গুলি যাচাই করিয়া লইতে হয়। অতীতের প্রতি অযথা শ্রদ্ধা এবং অন্ধগুরুবাদ আমাদের দেশে যুগমানবগণের প্রকৃত পরিচয় জানিবার পক্ষে এক বিষম অন্তরায়। তাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক মহাপুরুষের জীবনী মাত্র অলীক কথা ও কাহিনীতেই শেষ হইয়াছে।

ইহার উপর আছে সাম্প্রদায়িকতা। বিশাল ভারতের সনাতনধর্ম্মের পূণ্য তপোবনে এই যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে অখণ্ড ব্রহ্মের এমনই খণ্ড খণ্ড, দীনহীন, মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার ভিতর ঐশ্বর্য্য ও মাধূর্য্যের কোনও বিলাসই নাই। সকলের উপরে, ধর্ম্মজগতে মাৎসর্য্য ও উৎকট সঙ্কীর্ণতা আসিয়া, সমস্ত মহাপুরুষ ও তাঁহাদের সাধনার উপর এমনই অবগাঢ় কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে, যাহাতে ভবিষ্যতের পানে তাকাইতে আমাদের ভরসা হয় না। এইরূপে বস্তু

হইতে আমরা এখন এতদূরে, যেখান হইতে আসলের সন্ধান আর পাওয়া যায় না, নকলের ন্যাকামিতে অন্তরের সত্যটি নিয়ত আকুলি বিকুলি করে।

কেন এমন হইল? বিরাট-প্রাণতার অভাবেই যে এই সব ঘটিয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? মহাপুরুষগণ জগতে আসেন, সকলের জন্য, বিশিষ্ট কোন একটী সম্প্রদায়ের গুরুগিরি করিরার জন্য নয়। কতিপয় লোক তাঁহাদের কোন একজনের কৃপা লাভ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসে ইনি আমাদের, আর কাহারও নহেন। তাহার পর, সেই মহাত্মার তিরোধানের পর, তাঁহার সম্বন্ধে, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত সেই স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি যাহা বলিবে, তাহাই সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহা কল্পিত মাহাত্ম্যপূর্ণ হউক অথবা বিকৃত সত্যভরা এক মনোমুগ্ধকর কাহিনীই হউক।

এইরূপেই মহাপুরুষগণের প্রকৃত জীবনী ও সাধনতত্ত্ব সকলের অজ্ঞাতে থাকিয়া যায়। জাতির পক্ষে ইহা যে কত বড় ক্ষতি, কতখানি অপচয় তাহা আর কে বুঝিবে? সাধনার ভিতর দিয়া, দেশ উন্নত করিবার ও জাতি গঠনের যে দিব্য ও অমোঘ সঙ্কেত এই সব মহামানবগণ লাভ করেন, তাহা, তাঁহাদের জীবনীর প্রকৃত আলোচনার অভাবেই, আমরা পাইনা। জীবনব্যাপী সত্য-অনুসন্ধিৎসার মূলে যে দিব্য প্রেরণাটি তাঁহাদের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়. তাহারই আন্তরিক অনুসরণ করিয়া আমরা তাঁহাদের জীবনের সমগ্র পরিচয় পরিপূর্ণভাবে পাইতে পারি। ইহাই একমাত্র সূত্র।

এবং এই সূত্র ধরিয়া, সত্যবস্তুকে জানিবার আগ্রহেই আমি দুর্গমের পথে চলিয়াছি ; জানিনা, আমার এই প্রয়াস কতদূর সার্থক হইবে। জীবনী বলিতে সাধারণতঃ অনেকে যাহা বুঝিয়া থাকেন, আমার এই আলোচনার পরিমাপ ঠিক সেই ভাবে করা চলিবে না এই জন্য যে ইহার ভিতর মানুষ-বিজয়কৃষ্ণের সমস্ত পরিচয় না'ও মিলিতে পারে। বিজয়কৃষ্ণকে যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট আমার এই কথা, সহসা সমাদর না পাইলেও, এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইব যে,—

"তুমি মিছে ধরো দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ !
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন ব'সে।"

"রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥"

আরম্ভ

"The plain man clings to a belief in reality, something not merely the creation of his mind, or of the joint minds of greater brains than his own, something not dependent on the existence of man or on what man thinks about it. He is prepared to ask if it be not merely a human proposition to believe that space and time are the warp and the woof of reality, or there must be a before and after, that causes and consequence have a real relation.—"

ভারতের সাধনা

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

(১)

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে শ্রাবণপূর্ণিমাং ।
যস্যাং শ্রীবিজয়কৃষ্ণোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥

বাঙ্গালীর সাধনা যুগে যুগে অভিনব পন্থায় অভিনব আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। চিরাচরিত প্রথা ও প্রচলিত লোকমত বিবেকের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশে বর্জ্জন করিয়া, 'ঈশ্বর প্রাপ্ত-বস্তু' এই বিচিত্রবোধে আত্মচৈতন্য সমাহিত হওয়াই বাঙ্গালীর সাধনার বৈশিষ্ট্য। রূপকের আশ্রয়ে বাঙ্গালীর সিদ্ধপুরুষগণ কোনও দিন রূপের কল্পনা করেন নাই; তাই বাঙ্গালীর সাধনায় নিজের স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া, একান্ত ঘরের মানুষ হইয়া তিনি আসেন। চণ্ডীদাস, এই ভাব সাধনার অগ্রদূত; নদীয়ার গৌরাঙ্গ, ইহার সবিশেষ প্রবর্ত্তক। তাহার বহু বৎসর পরে, শান্তিপুরের বিজয়কৃষ্ণে এই সাধনার নির্ব্বিশেষ পরিণতি।

বাংলার এক মরমীকবির প্রাণে বৈষ্ণবের সিদ্ধ পীঠস্থান এই শান্তিপুর. কিরূপ ভাবের ঘোর লাগাইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি গাহিয়াছেন—

"নীলগাঙে তোর আলোর খেয়া ডাক দিয়েছে আজ মোরে,
জল ভরে মা মনের চোখের কূলে।
লুটিয়েছি মা তোর মাটিতে, কাঁচা সোনার কৈশোরে,
ফল্‌ত ফসল কান্না হাসির ফুলে।
ধন্য হলাম মাথায় তুলে, গায় মেখে তোর পা'র ধুলি
স্নেহের পরশ বুলিয়ে দে মা প্রাণে।
কাঁপ্‌ছে বুকে সুদূর যুগের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি,
স্মৃতির কোকিল ডাক্‌ছে মিঠে তানে।

* * * * * * *

তোর মাটি মা দিব্য মাটি অদ্বৈতের তপঃস্থল,
ধূলোট ধূলোয় উঠ্‌লরে নাম গান,
এই মাটিতে পড়ল ঝরে' সোনার গোরার অশ্রুজল,
ছাপিয়ে নদে এল প্রেমের বান।
এইখানে এই গঙ্গাকূলে, বস্‌ল 'বিজয়' যোগ-ধ্যানে,
প্রাণ কমলের পাপ্‌ড়ি খুলে যায়,
ডুব্‌ দিলরে আপ্‌না মাঝে বাঞ্ছিতেরি সন্ধানে,
মিট্‌ল তৃষা মধুর মোহানায়।"

সমস্ত বাংলার মধ্যে, শান্তিপুরের মতন, মধুর নামের দেশ বুঝি আর কোথাও নাই। নামের এমন সিদ্ধ পীঠস্থানের জোড়া মেলা ভার। প্রেমের ঠাকুর গোরাচাঁদের উদ্বোধন, অদ্বৈত এই নিভৃত স্থানে বসিয়াই করিয়াছিলেন।

সেই পূণ্যশ্লোক অদ্বৈতবংশের বহু অধস্তন পুরুষ আনন্দ-কিশোর গোস্বামীর সাধনলব্ধ ফল বিজয়কৃষ্ণ এই শান্তিপুরের

নিকটবর্ত্তী শীকারপুর গ্রামে, ঐ বংশের বংশধররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সেদিন ১২৪৮ সনের শ্রাবণী ঝুলনপূর্ণিমা। উপরে নীলাকাশে রূপালি চাঁদ, কৌমুদী ধারায় সমস্ত জগতে এক ভুবন ভুলান ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। প্রতি বৈষ্ণবের দেউলে গৃহদেবতার আজ ঝুলন-বিলাস। মর্ত্তের নরনারী আর্ত্তপ্রাণে মন্দিরে মন্দিরে এই উৎসব দেখিয়া অপার আনন্দে বলিতেছে—

"দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর।
নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন জোর॥
ললিতা বিশাখা সখি ঝুলাওত সুখে।
আনন্দ মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে॥
বিবিধ-কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরুডালে।
রতিজয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে॥"

সত্যই এ ঝুলনমাধুরীর তুলনা নাই। সুদূর অতীতে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ রাইকিশোরীকে লইয়া ঝুলন খেলায় সখীগণকে যে আনন্দামৃত পান করাইতেন, নদীয়ার বৈষ্ণবগণ সেই লীলা অনুসরণ করিয়া, মর্ত্ত্যজনকে আজও সেই অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করাইতেছেন। মায়াবাদী ইহাকে নিছক কল্পনা বলিতে পারে, বিজ্ঞানবাদী ইহাকে উপহাস করিতে পারে; কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ে তাঁহার লীলা নিত্য।

শান্তিপুরে সেদিন এমন ঝুলন হইতেছিল। তখন সন্ধ্যার

প্রাক্কাল। জননী স্বর্ণময়ী গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর-আরাধনার ফলে সেই পুণ্যতিথিতে বিজয়সুন্দর লাভ করিলেন। মহা-পুরুষের জন্মে একটু বৈচিত্র্য থাকে, কারণ তাঁহারা ভগবানের চিহ্নিত সন্তান। বিজয়কৃষ্ণের জন্মতে ইহার কোন ব্যতিক্রম ছিল না।

সাধারণ লোকের যে ভাবে জন্ম হয়, বিজয়কৃষ্ণের সে ভাবে হয় নাই। পুরুষানুক্রমে এই পবিত্র বংশে বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন সেই সমস্ত সাধনা ও তপস্যা যেন জমাট বাঁধিয়া এই দেবশিশু বিজকৃষ্ণের শরীরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। নবঘন কৃষ্ণরূপের অপরূপ ছটায়, সে-দিনের শ্রাবণী সন্ধ্যায় বুঝি আনন্দকিশোরের ক্ষুদ্র দেবায়তনটি উদ্ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, হরিদাস ছিল না, তাই এই দেবশিশুটির আগমনে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তেমন ভাবে সাড়া পড়ে নাই। নবাগতকে সাদর ও সস্নেহ অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য মালিনী অথবা সীতাদেবী আসেন নাই! অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া শিশু একাকী ধরিত্রীর কোলে সকলের অজ্ঞাতে আপনি ভূমিষ্ঠ হইল। বুঝি ঊর্দ্ধে দেববালিকারা মাত্র বৈকুণ্ঠের শুভাশীষ বহন করিয়া নবজাত শিশুর কপোলে অমৃতপরশ সিঞ্চন করিয়াছিল।

জন্মের বৈচিত্র্য ছিল যদিও সামান্য রকমের, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট। প্রথম পুত্র ব্রজগোপাল জন্মগ্রহণ করিবার তিন বৎসর পরে, আনন্দকিশোর একদিন গভীর রজনীতে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। পার্শ্বে প্রসুপ্তা সাধ্বী

পত্নী স্বর্ণময়ীকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, "এক দিব্য স্বপ্ন দেখিলাম! অচল বিগ্রহ সচলরূপ ধরিয়া আমার নিকট আসিয়া ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ও তাহার পর শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনরায় তোমার সহিত সহবাস করিবার প্রত্যক্ষ আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য কি তাহা বলিলেন না।"

বিস্মিতা বিমূঢ়া পত্নী কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সুখশয়নে বিচিত্র স্বপ্নমগ্না ছিলেন। প্রথম-উন্মেষিতযৌবনা মাত্র একটি পুত্র পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। যৌবন-সমাগমে তাঁহার হৃদয়ে নব নব আকাঙ্খা দিনে দিনে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতে-ছিল; লজ্জায় মাত্র তাহা স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাই অচিন্ত্যপূর্ব্ব এই স্বপ্ন-কাহিনী স্বামীর মুখে শুনিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পুরুষের পক্ষে যাহাই হউক, মুকুলিত যৌবনা, অষ্টাদশ বর্ষীয়া, ক্ষুৎকামকণ্ঠা নারীর পক্ষে ইহা বড় অসম্ভব কথা, অথচ গৃহদেবতার প্রত্যক্ষ নিদেশ। গৃহদেবতার সেবায় স্বর্ণময়ী আত্মনিয়োগ করিয়া স্বামীর সহধর্ম্মিনী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কামনা বাসনা তাঁহার চরণে আজও নিবেদন করেন নাই।

সেরাত্রি তাঁহার ভাল করিয়া আর নিদ্রা আসিল না; স্বামীকে কি উত্তর দিবেন তাহাই বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে রজনী উত্তীর্ণ হইল। প্রাতে, গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে, পরিস্নাতা হইয়া দেবপূজার পুষ্প চয়ন করিলেন। শ্রীচরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিবার সময় সরলা, নিরক্ষরা নারী, মর্ম্মবেদনায়

আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। সহসা শ্যামসুন্দরের চরণ-যুগল স্পৃষ্ট হইতেই এক বিপুল ভাব আসিয়া তাঁহাকে কিছু কাল অভিভূত করিয়া রাখিল। কি বুঝিলেন, তিনিই মাত্র জানিলেন। পূজা সমাপন করিয়া হৃষ্টমনে, ভাবাকুলনেত্রে স্বামীর চরণে প্রণতা হইয়া কহিলেন—"শ্যামসুন্দরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আজ হইতে আমরা তুজনে হরগৌরীব্রত গ্রহণ করিলাম।"

তাহার পর বহুদিন কাটিয়া গেল। গৃহদেবতার অর্চ্চনা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যগুলি আনন্দকিশোর ও স্বর্ণময়ী ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অবিচলা ভক্তি সহকারে পালন করিতে লাগিলেন। নিরূপিত সময়ে আনন্দকিশোর, শ্যামসুন্দরের আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, তিনি বিপুল কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া শান্তিপুর হইতে সমুদয় পথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করেন। প্রার্থনা অনুযায়ী ফললাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অনতিকাল পরে স্বর্ণময়ী গর্ভবতী হইলেন; সেই সময়, অন্তসত্ত্বাবস্থায় তিনি নিত্য উদয়াস্ত সূর্য্যের প্রতি কিরণরেখায় রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইতেন। মহাপুরুষের নিশ্চিত আগমন সম্ভাবনায় দম্পতীযুগল অধীর আনন্দে ও পরম উৎকণ্ঠায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময় সহসা এক দৈবতুর্ঘটনায় স্বর্ণময়ীকে তাঁহার পিতা গৌরীপ্রসাদ জোদ্দারের শীকারপুরের বাড়ীতে আসিতে হইল

ও আসন্নপ্রসবা বুঝিয়া স্বামিগৃহে পুনরাগমন করিতে পারেন নাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দিন অসম্ভব ঋণের দায়ে তাঁহার পিতা এমনই বিব্রত ছিলেন যে তিনি কন্যার প্রসবের কোনও প্রকার সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ইহার উপর, সন্ধ্যাসমাগমে প্রকৃতিদেবী কিছুক্ষণের জন্য তুমুল ঝড়, বৃষ্টি, তুফান তুলিয়া মর্ত্তে এই দেব-শিশুর আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। দুর্য্যোগের ভিতর ভক্তের আগমন আর কেহ জানিতে পারিল না।

প্রসব যন্ত্রনায় অল্পকাতরা স্বর্ণময়ী উপায়ান্তর না দেখিয়া, উপস্থিতবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া গৃহসংলগ্ন কচুবনে আশ্রয় লইলেন। সন্তান নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইল। পুরনারী কেহ শঙ্খধ্বনি করিবার অবকাশ পায় নাই। দুর্য্যোগের ভিতর দিয়াই ভগবান ও ভক্ত উভয়েই আসেন।

হৃদয়কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেন্তং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জনন মরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্য মীড়ে॥

যে বৎসর বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১২৪৮ সন বাঙ্গালীর পক্ষে আর একটি কারণে ঐতিহাসিক স্মরণীয় বৎসর। লোকোত্তরচরিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বৎসর ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন। তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই মহর্ষির ব্রাহ্ম-সমাজে জন্মগ্রহণ ও বিজয়কৃষ্ণের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ সমসাময়িক হওয়াতে যেন ইহাই সূচিত হয় যে বিচিত্রকর্ম্ম বিধাতা এই দুই ক্ষণজন্মা ও যুগন্ধর পুরুষকে ভবিষ্যতে একই কর্ম্মক্ষেত্রে সম্মিলিত করিবার পূর্ব্বায়োজন করিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণের পরবর্ত্তী জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই মহা-পুরুষ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"যে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব্ব হইতেই তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। জন্ম, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধন, এই চারিটি বস্তুর একত্র সংযোগ না হইলে, প্রকৃত সত্য বস্তু, অর্থাৎ ষোল আনা ধর্ম্ম লাভ হয় না।" আমরাও পরে দেখিতে পাইব যে বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এই কয়টির কিরূপ বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, বিশুদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর বংশে

জন্ম ; করুণাপূর্ণ, শুদ্ধ ও ভক্তিময় জীবনে পিতামাতার চরিত্রের প্রভাব ; আবাল্য সৎশিক্ষা ; সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ ও নিজ জীবনে কঠোর একাগ্র সাধনা। ইহার উপর ছিল ভগবানের পূর্ণমাত্রায় অহেতুক কৃপা।

তাই আমরা বিজয়চরিত্রে বিশিষ্টতা দেখিতে পাই "ধর্ম্মের উৎস-স্বরূপ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিতে হইবে, এবং দিবস যামিনী তাঁহার সহবাসে থাকিয়া, নিরাপদ ও উদ্বেগবাসনাবিহীন হইতে হইবে—" জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত এই দিব্য ভাবে বিভোর থাকায়। বিজয়কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ ও তাঁহার জীবন-ব্যাপী বৈচিত্র্যময় সাধনার মর্ম্ম ও তাঁহার পরা-অপরা সিদ্ধির রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার ইহাই একমাত্র মূলসূত্র। এই সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনের প্রতি অধ্যায়টি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

অগ্রজ গোপীমাধব গোস্বামীর মৃত্যুর সময় আনন্দ-কিশোর এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে তিনি তদীয় বিধবা ভ্রাতৃজায়ার হস্তে দত্তক প্রদান করিবেন। কিন্তু তখনও আনন্দকিশোর বিপত্নীক ছিলেন অর্থাৎ, পর পর দুইটি স্ত্রী অপুত্রক অবস্থায়, 'হাতের নোয়া ও মাথার সিঁদুর' বজায় রাখিয়া পরলোক গমন করায়, তিনি তদবধি জ্যেষ্ঠের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত অকৃতদার ছিলেন। তাই গোপীমাধবের মৃত্যুশয্যায় তাঁহার নিকট ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার সময় তিনি নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধিলিপি বুঝি তাহাই ছিল। যথা-

সময়ে কনিষ্ঠপুত্র বিজয়কৃষ্ণকে লাভ করিবার পর, ছয়মাস বয়সের শিশু সন্তানকে আনন্দকিশোর ভ্রাতৃজায়ার হস্তে শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী দত্তক প্রদান করেন।

গর্ভধারিণী স্বর্ণময়ী ইহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। পাঁচবৎসর পিতা মাতা ও দত্তক-গ্রহিত্রী মাতার নিরবিচ্ছিন্ন স্নেহ-ক্রোড়ে, নিরুদ্বেগে বাল্যকালের প্রথম সীমা-রেখা পার হইবার পর, বিজয়কৃষ্ণ নিয়তির বিচিত্র পরিহাসে দুঃখের প্রথম দহন অনুভব করিলেন, পিতা ও দত্তক-গ্রহিত্রী মাতার সহসা পরলোক গমনে। জননী স্বর্ণময়ী সংসারে একক হইয়া শ্যামসুন্দরের শ্রীচরণে সান্ত্বনা খুঁজিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতের জন্য যে সব সুখস্বপ্ন একে একে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সহসা স্বামীর অকাল মৃত্যুতে, সে গুলি ধূলিসাৎ হইয়া গেল। বিধবার নয়নের অশ্রু নিঃশব্দে ঝরিয়া শুকাইয়া গেল। বিদীর্য্যমান শোক অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া পুত্র দুইটিকে সযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বাঙ্লার ভবিষ্যৎ ধর্ম্মগুরুর জীবন এইরূপেই আরম্ভ হইয়াছিল।

তখনকার দিনে গোস্বামীগণের কথকতা ও শিষ্যবৃত্তিই প্রধান উপজীবিকা ছিল। শান্তিপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে আনন্দকিশোরের প্রায় সাত শত ঘর শিষ্য ছিল। ইহাদের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া স্বর্ণময়ী সংসার চালাইতে লাগিলেন। গৃহদেবতার একান্ত আশীর্ব্বাদে তিনি বিশেষ কোন কষ্ট পান নাই।

শৈশবের চাপল্য তিরোহিত হইবার পর বিজয়কৃষ্ণ গ্রাম্য

পাঠশালায় কিছু দিন শিক্ষা লাভ করেন। তখনও শান্তিপুরে কোন ইংরাজি স্কুল ছিল না। পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত হইবে এই আশায় জননী পুত্রকে শান্তিপুরের গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিখ্যাত টোলে সংস্কৃত শিখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথাসময়ে বিজয়কৃষ্ণের উপনয়ন ও কৌলিক দীক্ষা হয়। নিষ্ঠাবতী জননীর অপূর্ব্ব আদর্শ-জীবন-খানি সম্মুখে রাখিয়া বিজয়কৃষ্ণ সেই ভাবে নিজের চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন ও স্বর্গীয় পিতার ন্যায় তিনিও তখন পর্য্যন্ত পরম নিষ্ঠাবান একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিকতার উপর বিন্দুমাত্র সশ্রদ্ধ হইতে পারেন নাই। গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরের তিনি কতখানি কৃপাপাত্র ছিলেন পরিণত জীবনে তাহা সাধনায় উপলব্ধি করিয়া তিনি স্বীকার করিয়া ছিলেন। প্রত্যক্ষের সহিত অনুভূতির যতক্ষণ না নিঃসংশয় ভাবে সামঞ্জস্য ঘটিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধভক্তিতে তিনি কিছুই মানিতেন না; বিজয়চরিত্রের ইহাই আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পৌত্তলিকতার বিরোধী এই দেব-শিশুটিকে পরবর্ত্তী জীবনে দেখিতে পাই, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, শ্যামসুন্দরের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, অঝোর ধারায় কাঁদিতে। দরদর ধারে চক্ষের জল বিশাল বক্ষ বহিয়া শ্রীঅঙ্গন সিক্ত করিতেছে। অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া নিস্পন্দ নেত্রে মৃন্ময় বিগ্রহের সম্মুখে রোরুদ্যমান শিশুটির মতন দাঁড়াইয়া। ইহাত কল্পিত ভাবুকতা নয় অথবা অন্ধভক্তির অর্থহীন উৎকট আতিশয্য নয়।

তবে ইহা কি ? কোন দুর্ল্লভ সাধনায় জড় পুত্তলিকার ভিতর 'রসরাজ মহাভাবের' চিন্ময় বিলাস দিব্য চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়া, মানুষ এমন ভাবে স্থানকালপাত্র সমস্ত ভুলিয়া, আত্মহারা হইতে পারে ? বিজয়কৃষ্ণের সাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলেই ইহার সহজ উত্তর পাইব। যথাস্থানে এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা হইবে।

বিজয়কৃষ্ণের কিশোরবয়সে কয়েকটি সাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়া, মনে কিরূপ বিচিত্র অবস্থার সমাবেশ হইয়াছিল ও তাহাতে সেই সময় তাঁহার চিত্ত-অরবিন্দের গোটা দুই দল কি আবেশে মুকুলিত হইয়া তাঁহাকে আত্মজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষালাভের সহায়তা করিয়াছিল, তাহার দুইটি এইখানে সংক্ষেপে বলিব।

প্রথম ঘটনাটিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজমুখে তাহা এইভাবে বলিয়াছেন—"আমার যখন ১২ বৎসর বয়স, সেই সময় আমার একটি খেলিবার সঙ্গী মরিয়া যায়। আমাদের একটি মেটে দেল্‌কো ছিল, তাহাতে প্রদীপ রাখিয়া রাত্রিতে পড়িতাম ও খেলা করিতাম। ঐ সঙ্গীটি মরিলে, একদিন ঐ দেল্‌কো দেখিয়া মনে হইল যে, এই মাটির বস্তুটি আছে,—সে নাই, ইহা হইতে পারেনা। তাহার পর যে কাঁটাল তলায় খেলা করিতাম, সেই গাছটি দেখিয়াও মনে হইল,—কাঁটাল গাছ আছে, সে কোথায় ? অবশ্যই আছে।

"জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই হইবে। রাজা পৃথু, জনক, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ, দুর্য্যোধন, রাবণ, কংস, ইহাঁরা কত দিগ্‌বিজয় করেছেন, কিন্তু তাঁহারাও শ্মশানে ভস্মীভূত।

যাঁরা অবতার—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, বলরাম, ইহাঁরাও দেহত্যাগ করিয়াছেন। জন্মমৃত্যুর যে কি রহস্য, জানিয়াও নিস্তার নাই। এই মৃত্যু কত মঙ্গলের জন্য তাহা অনেকে চিন্তা করেন না। একজন চিররোগী, অসহ্য যন্ত্রণা; যদি মৃত্যু না হয়, তাহার উপায় কি? কত জীবজন্তু মরিতেছে কে তাহার খবর লয়? কত স্থানে কত নরনারীর মৃত্যু হইতেছে, তাহা কে জানে? আমার বাটীর ঘটনা হইলেই আমার চিন্তা। রোজ এক লক্ষ লোক জন্মায়, এক লক্ষ মরে। প্রদীপের তৈল ফুরাইলে নিবিয়া যায়, মৃত্যুও সেইরূপ। সংসারে যাদের আসক্তি, তাদেরই মৃত্যু ভয়।

"মৃত্যু দিনরাত্রির মত স্বাভাবিক কার্য্য। জন্ম-মৃত্যু,—একই মোহ। যখন জন্ম-মৃত্যু, বৃক্ষের পত্র পতিত হওয়াও গজানবৎ বোধ হইবে, তখন আমি কি, যথার্থ বুঝা যায়।"

এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে পরবর্ত্তিকালে সাধনজীবনের উন্নততম অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সংস্কার-বিহীন সেই কিশোরবয়সেই বন্ধু-বিয়োগ বেদনার ভিতর দিয়া তিনি আত্মার—অবিনশ্বরত্ব সম্যক ভাবেই বুঝিয়াছিলেন ও আত্মার জন্ম-মরণ নাই বলিয়া, ইহা জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং মরণ এই ষড়বিধ বিকার বর্জ্জিত, এই চরম জ্ঞানে, অতি সহজে উপনীত হইয়াছিলেন। সংসারের প্রাত্যহিক ব্যাপার এই জন্ম-মৃত্যু। কিন্তু আমরা কয়জন ইহার ভিতর দিয়া ভারতীয় সাধনার এই শ্রেষ্ঠ আত্ম-তত্ত্বের কথা বুঝিবার চেষ্টা করি?

তাহার পরের ঘটনা তাঁহার সম্বন্ধে না হইলেও, তাঁহাদেরই বাড়ীর নিকটে হইয়াছিল। তিনি তাহা এইরূপে বলিয়াছেন—"শান্তিপুরের এক পাড়ার ভিতরে অল্প বয়সে একটি ছেলে ও মেয়েতে ভালবাসা হয়। যেমন উহাদের বয়স হইতে লাগিল, ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাড়ার সকলে উহাদের অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া, নানা কুকথা বলিতে লাগিল। মেয়েটি একদিন ছেলেটিকে বলিল, 'দশজনে নানা কথা বলিতেছে, আর তুমি আমার নিকটে এরূপ এসনা'। ছেলেটি ঐ কথা শুনিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেল ; দিনরাত বিষম যন্ত্রনা পাইতে লাগিল। অবিলম্বেই মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে মেয়েটি যখন শ্বশুরবাড়ী চলিল, ছেলেটিও কাঁদিতে কাঁদিতে তার পিছনে পিছনে চলিল। সকলে উহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী ছেলেটিকে দেখিয়া বলিলেন—'আহা তুমি যদি কোনও দেবতাকে ঐরূপ ভালবাস্তে, তাহ'লে এতদিনে উদ্ধার হ'য়ে যেতে। তুমি কোন দেবতাকে ভালবাস ?' ছেলেটি বলিল, 'হাঁ, আমি রামকে বড় ভালবাসি।' সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা দিয়া, রামনাম জপ করিতে বলিয়া গেলেন। পাড়ায় এক বাড়ীতে রামমূর্ত্তি আছেন ; ছেলেটি প্রত্যহ সেখানে গিয়া, ঠাকুরের নিকট বসিয়া জপ করিত। জপের সময় ছেলেটির দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। রামজীকে ভোগ লাগাইয়া, সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। এমন দেখা গিয়াছে, খাবার নিয়া দুই তিনদিন রামজীর সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতেছে, তথাপি

রামজী প্রসাদ না করিয়া দিলে আহার করে নাই। ঐ ছেলেটি বেশী দিন আর টিকিল না, কিছুকাল পরেই মরিয়া গেল।"

এই ঘটনার ভিতর দিয়া কিশোরবয়সে তিনি যে তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরিণত জীবনে তাহা তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোকেই হউক, আর যাতেই হউক, সমস্তটি প্রাণ একটা স্থানে ঢেলে দিয়ে, একান্তপ্রাণে একচিত্তে বস্‌তে পারলেই তো হয়! তা কি আর সহজ কথা? তা আর হয় কই? প্রকৃত সৌহার্দ্দ্য আজকাল বড়ই দুর্ল্লভ। একজনে অন্যজনকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে, এ বড় দেখা যায় না।"

বাঙ্গালীর ভাব-সিদ্ধ এই কিশোর দেব-শিশুটির, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল অন্তরে, আত্ম-সমর্পণের প্রথম বীজটি সেদিন এইরূপেই উপ্ত হইয়াছিল। বৈষ্ণবসাধনার অব্যর্থ মন্ত্রটি বিজয়কৃষ্ণ এইখানেই লাভ করিলেন। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও তৃপ্তি হয় না, 'আমার' বলিয়া কিছু না রাখিয়া, হৃদয়লয়ের সহিত বোধের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত, তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিতে পারিলে, বুঝি এই আত্মসমর্পণ-যোগ সিদ্ধ হয় ও তখন আপনা-আপনি, দেহাতীত জগতে, সমস্ত অন্তর মথিয়া, এক দিব্য বাণী উঠে, নিবিড় রস-অনুরাগের প্রতি আস্বাদনে অ-শ্রুত, অ-গীত সেই বাণী, শত সঙ্গীতের রণনে বাজিয়া উঠে—

"শিশুকাল হইতে, বন্ধুর সহিতে,
পরাণে পরাণে লেহা।

না জানি কি লাগি, কো বিধি গড়ল,
ভিন ভিন করি দেহা।
সই! কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারি পাসরিতে
কি দিয়া সুধিব ধার॥"

"The transfer of all allegiance from God to machinery, to inanimate ideals and formulas, has everywhere produced an atmosphere of constraint, compulsion and coercion. A lie at the heart must belie the truth on the lip."

ইহার পর আমরা বিজয়কৃষ্ণকে দেখিতে পাই, কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থীরূপে। যৌবনের প্রারম্ভে, শিশু-প্রকৃতি, এবং সরল ও সতেজ মন লইয়া, তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী অঘোরনাথের সহিত, নব্যবঙ্গের নবীনা নগরী কলিকাতায় আসেন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র।

বাঙ্গালার কৃষ্টির তালিকায় যদিও সাধু অঘোরনাথের নাম নাই, কিন্তু সেযুগে শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশব সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অন্যতম পুরোধাগণ, স্বভাব-সরল, আজন্ম ভগবৎ-বিশ্বাসী এই অঘোরনাথের সংস্পর্শে আসিয়া, বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বর্ত্তমানের বিলাসপূর্ণ সভ্যতার যুগে তিনি এমনি একটী অপূর্ব্ব পদার্থ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোর নাথের চরিত্রে বহু সামঞ্জস্য ছিল। পরবর্ত্তিকালে উভয়েই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও ইহার বাহিরে যথেষ্ট প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন। বহু সদ্‌গুণের আধার এই দেবকল্প চরিত্রের ইহার বেশী পরিচয় তখনকার "তত্ত্বকৌমুদী" হইতে পাওয়া যায় না।

১২৬৬ সাল। নব্যবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তখন ঘোর নাস্তিকতায় পূর্ণ। কোথাও ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ নাই। পাশ্চাত্যের যুগ-প্লাবী শিক্ষার আবর্ত্ত তখন কলিকাতার বুক ছাপাইয়া কানায় কানায় উঠিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার 'নালান্দা' তখন ছিল এই মহানগরী। পশ্চিমের চাকচিক্য পূর্ণ চটুল সভ্যতা, ইংরাজী-শিক্ষিত মাত্রকেই যেন একটা অভিনব চমক লাগাইয়া দিল। বাঙ্গালীর যে চক্ষু তাহার নিভৃত পল্লীগৃহের মৃৎপ্রদীপের স্নিগ্ধ কিরণে অভ্যস্ত ছিল, আজ তাহা এই বিচিত্র সভ্যতার বিজলী ঝলকে একেবারে ধাঁধাইয়া গেল। ধর্ম্ম-বিশ্বাসবিহীন শিক্ষার প্রভাবে, নব্য যুবকগণ দেখিতে দেখিতে, গর্ব্বিত, উদ্ধত ও উন্মার্গগামী হইয়া উঠিল। 'হেদোবনের কেঁদো-বাঘ' ডাক্তার ডফের কৃপায় অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক খৃষ্টধর্ম্মে, ধর্ম্মান্তরিত হইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া হিন্দু-কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায়, ছাত্রগণের কতখানি নৈতিক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল, লজ্জাস্কর সে ইতিবৃত্তের পুনরুল্লেখ বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। 'পরম দয়ালু'র ধর্ম্মে যথেচ্ছা পানভোজন করিবার অবাধ স্বাধীনতা পাইয়া বাঙ্গলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ সেদিন এক বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল।

শান্তিপুর হইতে নবাগত যুবক বিজয়কৃষ্ণের চক্ষে ইহা এক বীভৎসতার সৃষ্টি করিল। এই যৌবনজল-তরঙ্গে তিনি ভাসিয়া যান নাই। সামাজিক উপপ্লব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়া চলিলেন। তিনি নিজের গ্রাম্য সরলতা ও কৌলিক প্রথা, সভ্যতার যুপকাষ্ঠে বলি দেন নাই। বংশগত আচার-

ব্যবহার পূর্ব্বে যেমন মানিয়া চলিতেন, আজও কলিকাতায় আসিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। স্বজাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ সেদিন তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। নিজের ব্যক্তিত্বের সুদৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়াইয়া, বহু সমপাঠী কর্ত্তৃক 'শান্তিপুরে গোঁসাই' বলিয়া উপহসিত হইলেও, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি দিনেরও তরে, সার্দ্ধহস্ত পরিমিত মাথার টিকী, গলায় মোটা মালা ও পৈতা, কপালে তিলক ও আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদ তিনি ত্যাগ করেন নাই। ভগবৎচালিত এই শুদ্ধ আধারটি, সেদিন এইরূপেই রক্ষিত হইয়াছিল। স্বর্ণময়ীর স্নেহের দুলাল, জননীর অঞ্চলছায়া হইতে বহুদূরে আসিয়া, বংশগত মর্য্যাদা, কুলগত প্রথা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে ত্যাগ করেন নাই, লোকপরম্পরায় ইহা সবিশেষ জানিয়া, মাতৃহৃদয় আশায়, আনন্দে আশ্বস্ত হইয়াছিল।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় বুঝি অন্যরূপ ছিল। বাঙ্গালীর নৈতিক অবনতির সেই চরম দুর্দ্দিনে, সমাজের সেই সঙ্কট-সময়ে, প্রয়োজন হইয়াছিল, রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপুল প্রচার। মিশনারীগণের সহিত সমপ্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার ১২৬৪ সাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত প্রচারক পাওয়া যায় নাই। শুভক্ষণে অদ্ভুতকর্ম্মা আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১২৬৫ সনে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন ও মহর্ষির শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া তাহার দুই বৎসর পরে সেই ধর্ম্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঠিক সেই সময় ১২৬৭ সনে ধীরে ধীরে বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে সংশয়ের একখণ্ড লঘু মেঘ সঞ্চারিত হইয়া, সহসা এই গোস্বামী-সন্তানটিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। যে আবহাওয়ার মধ্যে তিনি থাকিতেন, তাহা, নানা ভাবপূর্ণ ও বিবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভরা, অর্থচ সকলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ ও সহপাঠী। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন তাঁহার অন্যতম সহাধ্যায়ী ছিলেন। যতই দিনের পর দিন নিজেকে অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন, ততই, সঙ্গিগণের বিভিন্নপ্রকার ভাব ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস, তাঁহার প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বিপুল সংশয় ও কৌলিক কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে অনাস্থা জন্মাইয়া দিতে লাগিল। নানা মত ও নানা পথের ভিতর দিয়া যাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন খাঁটী ও দিব্য হইয়া একটি অভিনব ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে, বাঙ্গলার ভাবী ভক্তবীর সেই বিজয়কৃষ্ণ আজ এই দোতুল্যমান অবস্থার মধ্যে আসিয়া, কি করিবেন, তাহা বুঝি প্রথমে সুনিশ্চিত ভাবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; অথচ, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়, এইরূপ কুসংস্কারের উপর তাঁহার মন প্রচণ্ড বিদ্রোহে একদিকে যেমন নীরবে, সকলের অজ্ঞাতে গর্জ্জিয়া উঠিতে ছিল, অন্যদিকে, তাঁহার স্ফুটমান অন্তরে সত্যের প্রতি একটি অচিন্ত্যপূর্ব্ব আকর্ষণ, ঠিক তেমনি ভাবে দিনে পর দিন অপ্রতিহত বেগে বাড়িয়া, তাঁহাকে অধীর, উন্মত্ত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। এই রকম দুইটি বিভিন্ন বৃত্তিময় ভাবের মধ্যে পড়িয়া তিনি যে কিছুদিন দিশাহারা হইয়াছিলেন তাহা, সহজেই আমরা বুঝিতে পারি।

সংশয়পূর্ণ বিচিত্র ঘটনার সমাবেশেই মহাপুরুষগণের চরিত্রের মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে। বিজয়কৃষ্ণের মনের অবস্থা যখন এইরূপ,—কি করিব, কি না করিব'র মধ্যে যখন তাঁহার দিনগুলি কলেজের নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিয়া কাটিতেছিল, ঠিক সেই সময় তাঁহার যৌবন-পুষ্প প্রতি দলে দলে মুকুলিত হইয়া, অন্তরসঞ্চিত মধু, অনাগতা ভ্রমরীকে পান করাইবার জন্য, ব্যগ্র না হইলেও, কিঞ্চিৎ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল।

বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া, জননী স্বর্ণময়ী যথাসময়ে পুত্রকে কলিকাতায় খবর পাঠাইলেন। পল্লীর সুশীতল ছায়ায়, গৃহদেবতার শ্রীঅঙ্গনের সান্ধ্য সংকীর্ত্তনে, কলনাদিনী গঙ্গার তীর হইতে অস্তায়মান সূর্য্যের বিচিত্র বর্ণময়ী রশ্মিরেখার মনোমুগ্ধকর বিলাস দর্শনে, মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-সুধা পানে, মন শান্ত হইতে পারে এই আশাতেই, বিজয়কৃষ্ণ মায়ের কথামত শান্তিপুরে আসিলেন। ক্ষুদ্র কুটীরখানির অঙ্গে অঙ্গে তখন উৎসব-সজ্জা; আত্মীয়, অনাত্মীয়, কুটুম্ব স্বজনে বাড়ীখানি ভরিয়া গিয়াছে; বালক বালিকার কলহাস্যে পল্লীর সেই নিস্তব্ধ একাংশ মুখরিত। অনাড়ম্বর, পারিপাট্যহীন উৎসবের আনন্দে বিজয়কৃষ্ণও আনন্দিত হইলেন। বালসুলভ চপলতার সহিত মাতৃচরণে প্রণত হইয়া, তদীয় কুশল জিজ্ঞাসায় মাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

শুভদিনে, শুভলগ্নে আট বৎসরের বালিকা যোগমায়া বিজয়কৃষ্ণের সহিত পরিণীতা হইলেন। পিতা রামচন্দ্র ভাদুড়ী ও মাতা মুক্তকেশী দেবীর এই কন্যা, বিজয়কৃষ্ণের পরিণত

জীবনে, তাঁহার ধর্ম্মে, কর্ম্মে, যেরূপ উৎসাহ প্রদায়িনী, তপস্থায় তপশ্চারিণী, ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, এই দেবকন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়, তাহাও সেই বিধাতারই অভিপ্রেত ছিল।

যোগমায়া যেন মূর্ত্তিমতী কোমলতা। এমন স্বভাবসুন্দর, ভগবৎ-সমাহিত প্রাণ, বিশুদ্ধ প্রেমের সুনির্ম্মল আধার, মাতৃত্বের এমন মহিয়সী প্রতিমা, বুঝি সে যুগে বধূ যোগমায়ার চরিত্রেই সম্ভব ছিল। স্বামীকে নিজের ভালবাসা ও সেবার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, তাঁহার ধর্ম্মের ও কর্ম্মের পথে, স্বার্থের পাষাণ প্রাচীর গাঁথিয়া দেন নাই। অথচ কি গৃহে, কি সংসারে, কি সন্ন্যাসে, সকল সময় স্বামীর অনুগামিনী ও অনুরাগিণী ছিলেন। পর-দুঃখবিগলিত প্রাণা, ভারতীয় সাধনার দ্বিতীয়া গার্গী, এই সাধ্বীর চরিত্রে পরিণত জীবনে এমনই অসংখ্য সদ্-গুণের ও সাত্ত্বিকভাবের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, যাহা দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"অন্তঃশুদ্ধা, এই ব্রতচারিণীর সাহচর্য্য, আমার তপস্যা ও সাধনাকে অনেকাংশে সহজ করিয়া দিয়াছে।"

বিবাহের অনতিকাল পরে বালিকাবধূকে মায়ের নিকট রাখিয়া বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আদ্য-পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বাল্যবন্ধু অঘোরনাথের উৎসাহে বেদান্ত-শাস্ত্র আলোচনায় ব্রতী হইলেন। ক্রমে ক্রমে সাংখ্য, পাতঞ্জল ন্যায়, বৈশেষিকন্যায়, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ অল্প বিস্তর পাঠ করিয়া, বেদান্ত চর্চ্চা করিতে করিতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মিল। কৌলিক প্রথা তখন, অর্থহীন

বলিয়া মনে হইল। প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম্মগুলির ভিতর বেদান্ত মতানুযায়ী যুক্তিবাদ খুঁজিতে লাগিলেন। এইরূপে অদ্বৈতবংশের গোস্বামীসন্তান ঘোর বৈদান্তিক হইয়া উঠিলেন এবং ইহার অল্পদিন পরেই "অহং ব্রহ্মবাদ" গ্রহণ করিয়া, দেবার্চ্চনা ও পূজার আবশ্যকতা অস্বীকার করিলেন।

কাহারও অনুরোধে তিনি সহসা এই কার্য্য করেন নাই, তাহা যদি হইত, তবে ভবিষ্যতে ধর্ম্মগুরুর আসনে আমরা বিজয়কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম না। তিনি সকল জিনিষের মধ্যে, প্রতি ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের ভিতর, পরম সত্যের অনুসন্ধান করিতেন। যাহার ভিতর এই বস্তুর অভাব বোধ করিতেন, তাহা নির্ব্বিচারে পরিত্যাগ করিতে তিনি কোনও দিন দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই বাল্যকালে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের নয়নমনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে কোনরূপ ভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলিতে অসমর্থ হওয়ায়, তিনি সেই মূর্ত্তিতে চিন্ময়ত্ব আরোপ করিয়া তাহার ভগবত্তায় বিশ্বাসী হইতে পারেন নাই।

বাল্যাবধি তাঁহার অন্তর দলিয়া মথিয়া, যে দিব্য প্রেরণাটি, সত্যের সন্ধানে, ফুটি' ফুটি' করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাহা আজ অনেক বিচারের পর, "অহং ব্রহ্মবাদের" ভিতর দিয়া, প্রকাশ পাইবার প্রথম প্রয়াস পাইল। কণ্ঠের মালা, মস্তকের শিখা, কপালের সুচারু তিলক, বেদান্তের অদ্বৈতজ্ঞানের বিজলীঝলকে আজ যাহা অবলুপ্ত হইল, তাহা পুনরায় সুদীর্ঘ বাইস বৎসর পরে, শ্রীঅঙ্গের শোভা

সমধিক বর্দ্ধন করিয়া, ফিরিয়া আসিয়াছিল। সত্যের খাতিরে যাহা একদিন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ঘাত প্রতিঘাত সম্বলিত বহুমুখী সাধনার ভিতর দিয়া সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে, শুধু প্রত্যক্ষ নয়, তাহাকে ইচ্ছানুযায়ী সম্ভোগ ও তাহার সহিত অহোরাত্র বিহার করিয়া, সেইগুলি তিনি আবার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এম্‌নি করিয়াই তিনি সত্যকে সমস্ত জিনিষের ভিতর, পৌত্তলিকতা, আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া পরখ করিয়া, সংশয় সন্দেহের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে করিতে স্বীয় জীবনের সাধনাখানি, ভবিষ্যৎ বংশধর, আমাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্বার একটী জীবন্ত আদর্শ-স্বরূপে মাত্র নয়, সত্যের একটী অখণ্ড আধাররূপেও বটে—যাহার সন্ধান বাঙ্গালী কোনও যুগে এমন নিখুঁতভাবে পায় নাই। দৈন্য-অবসন্ন লাঞ্ছিত আমরা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরবগর্ব্বে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতী প্রভায় দিশাহারা, আত্মহারা হইয়া, মহনীয়, বরণীয়, বাঙ্গালীর এই একান্ত আপনার ঘরের মানুষটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইয়া উঠিতে পারি নাই।



সাধ্বী যোগমায়া

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।
নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে ;
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিকে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিজয়কৃষ্ণের পিতা আনন্দকিশোরের অনেক শিষ্য ছিল। এই সব শিষ্যবাড়ী হইতে বাৎসরিক গুরুপ্রণামী যাহা পাওয়া যাইত, তখনকার দিনে তাহার মূল্য ছিল অনেক। পিতার মৃত্যুকালে এই শিষ্যসম্পত্তির কিছু অংশ বিজয়কৃষ্ণ পাইয়াছিলেন।

বেদান্তমার্গে প্রবেশের পর, তিনি অবসর মত শিষ্য বাড়ী যাইতেন। একদা এইরূপভাবে, বিজয়কৃষ্ণ, বগুড়ার অন্তর্গত কোন গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু শিষ্যের বাড়ী আসিয়াছিলেন। একে গুরুপুত্র, তাহার উপর অদ্বৈতবংশের সন্তান, স্বভাব-মধুর ব্যবহারে, তিনি সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করিতেন। এই সময়, একটি দিনের সামান্য ঘটনায়, আজন্ম সত্যের সাধক

বিজয়কৃষ্ণের মনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই পরিবারের এক বৃদ্ধা ও নিষ্ঠাবতী স্ত্রীলোক আপনার অন্তরের সরল বুদ্ধিতে গুরুপুত্রের পায়ে আভূমি প্রণতা হইয়া,-'আমায় উদ্ধার কর' বলিয়া কাতরকণ্ঠে মর্ম্মান্তিক বেদনা নিবেদন করিতে থাকে। বিজয়কৃষ্ণ ইহাতে এতদূর বিচলিত হইলেন যে কিছুক্ষণ, স্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর—সহসা অন্তরে বিবেকের সুস্পষ্ট বাণী ধ্বনিত হইতে শুনিলেন,—বাহির হইতে সমস্ত চিত্তবৃত্তি ক্ষণেকের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া অন্তর্লীন হইল। উৎকর্ণ হইয়া তিনি শুনিলেন—'পরলোক চিন্তা কর।'

এ ইঙ্গিত কাহার, কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল —এই চিন্তায় তিনি স্থানকাল পাত্র ভুলিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। হৃদয়ের আর একটি গ্রন্থি যেন ভেদ হইয়া গেল। শিষ্যপ্রদত্ত পূজাউপচার, গুরুপ্রণামী সব পড়িয়া রহিল। তিনি বগুড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। বেদান্ত-অধ্যয়নে আর মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। অদ্বৈতবাদ নীরস বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে শুষ্ক বেদান্তের "অহং ব্রহ্ম-বাদে", বিজয়কৃষ্ণের অন্তরের শান্তির ভূমি উৎখাত হইয়া গেল।

সংশয়াত্মিকা বুদ্ধির আবর্ত্তে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বনিয়াদ বিজয়-কৃষ্ণের এই দ্বিতীয়বার শিথিল হইল। বগুড়ায় শিষ্যবাড়ী যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা ত "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল" গোছের শোনা নয়, তাহা যে মর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্মার চৈতন্য-ভূমিতে উদ্গীতবাণী, অন্তর্যামীর দিব্য আহ্বান। "আমার যাহা সাধ্যাতীত ও ক্ষমতার বাহিরে, অথচ লোকের

মনে বিপরীত ধারণা ঘটাইবার, বাহ্যিক ঠাটটমক এই গুরু-গিরি,—ইহা আত্মজ্ঞানলাভ ও ব্রহ্মদর্শনভিন্ন, ধর্ম্মের নামে এক বিপুল ভণ্ডামী—” এই সিদ্ধান্ত করিয়া বিজয়কৃষ্ণ পিতৃ-প্রদত্ত গুরু-গিরি ব্যবসা ত্যাগ করিলেন।

এইবার তিনি ‘একেশ্বর’ উপাসনা আরম্ভ করিলেন। ‘এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি’-এই বোধে আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও তিনি প্রকৃত শান্তি পাইলেন না। কি এক পরম বস্তুর অভাব নিয়তই বোধ করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন করেন মাত্র, কিছুই পরিষ্কার বুঝিতে পারেন না। হৃদয়, মন, প্রাণ সব যেন তিনি হারাইয়া ফেলিলেন—পৃথিবীময় এক বিরাট শূন্যতা দেখিয়া তাঁহার অন্তর হাহাকার করিয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনায় কাঁদিয়া উঠিত। আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া এক গাঢ় অন্ধকার যেন তাঁহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত করিতে উদ্যত হইল। প্রাণের আকুল যাতনায়, কত নীরব নিশীথে তিনি কাঁদিতেন আর বলিতেন—

“অসতো মা সৎ গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়।”

সত্যের জন্য এই ঐকান্তিক দৃঢ় আকুলতার ভিতর দিয়াই কি সেদিন, ভবিষ্যৎ সাধনার অব্যর্থ বীজটি, তাঁহার অন্তরে ভগবান সযত্নে, সস্নেহে শ্রীহস্তে রোপণ করিয়া দিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ সেই দুর্দ্দিনে বুঝি কিছুকালের জন্য একটী পথ পাইলেন। ব্রাহ্মসমাজের নাম তিনি সহপাঠীদের মুখে তখন প্রায়ই শুনিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে

দুর্নীতিমূলক অপবাদ শুনিয়া, নিরুৎসাহ হইতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন। সেখানে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতায় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইলেন। কিছুদিন যাওয়া আসা করিবার পর ১২৬৮ সনে অঘোরনাথের সহিত একত্রে মহর্ষির নিকট প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বংশ-মর্য্যাদা, কুল-গরিমা, সমাজ, সংসার কিছুই সেদিন বিজয়কৃষ্ণকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। যে ধর্ম্মে, যে মতে সত্য পাইবার বিন্দুমাত্র অবকাশ বা আশা আছে বুঝিতেন, অবিচলিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সমাজের উদ্যত শাসন-সম্মার্জনী, মাতৃ-হৃদয়ের অসীম স্নেহ-বিগলিত করুণা, বন্ধুবান্ধবের উপেক্ষা, আত্মীয়-স্বজনের উপহাস, সমস্ত একধারে রাখিয়া, বিবেকের সুনির্দ্দিষ্ট বিধানে, সত্য পাইব,—বলবতী এই আশায়, বাংলার ভাবী গুরু, সেদিন ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। সত্যের চেয়ে বড় কোন জিনিষ হইতে পারে তাহা বিজয়কৃষ্ণ কোন দিনই স্বীকার করেন নাই।

পরিণত জীবনে তাই তিনি বলিতেন—"নিজ কর্ত্তব্যে যদি দৃঢ়তা থাকে, সত্যে ও ধর্ম্মে যদি একান্ত নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যক্ষ, রক্ষ পিশাচাদির সহিত মিলিত হ'য়েও স্বয়ং ভগবান তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে কিছুই করিতে পারেন না। সত্যের সর্ব্বত্রই জয় জান্‌বে। যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম তাহাতেই স্থির থাক্‌বে। ভগবান্‌ও যদি নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য দেখায়ে বিচলিত করতে চেষ্টা করেন, কখনই টল্‌বেনা। তিনি যদি

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পরাস্ত করতে চেষ্টা করেন, পারবেন না। দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরাস্ত হবেন, তাঁর কৃপায় সর্ব্বত্র সত্যের জয় হয়।"

আজ তাই মনে হয়, সেদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময়, তাঁহার পক্ষে সহায়ের একমাত্র জিনিষ ছিল ঋষিদের সাধন-লব্ধ সেই দিব্য বাণী—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাম্ চেতাংসি কোন্থ বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

যাহার প্রভাবে সত্যসুন্দর, বিজয়কৃষ্ণ আজীবন সর্ব্বত্রই, কি গৃহে, কি আশ্রমে, সত্যের বিজয়-পতাকা বহন করিয়া ফিরিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণ শান্তি পাইলেন। তিনি একটি নূতন মানুষ হইলেন। নিয়মিতভাবে সমাজে সমবেত ভ্রাতা ভগ্নীগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলেন। বেদীতে উপবিষ্ট, মহর্ষির আচার্য্য মূর্ত্তিখানি, দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন, শুধু তাহাই নহে, সৌম্যমূর্ত্তি, প্রশান্ত নয়ন, অগ্নিময়ী বাণী—যাহা কিছু মহর্ষির ভিতর দেখিতেন, তাহাতেই ভারতীয় সাধনার নির্ম্মৎসর সত্ত্বা অনুভব করিতে করিতে আত্মহারা হইতেন। ব্রাহ্মসমাজ সে দিন ধন্য হইয়াছিল মহর্ষির মতন এমন দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন আচার্য্য পাইয়া, আর বিজয়কৃষ্ণের মতন এমন একটি প্রকৃত সন্তান পাইয়া। ক্রমশঃ ভক্তবীরের হৃদয় ভক্তির ভোগবতী ধারায় সিঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মহর্ষির অগ্নিগর্ভবাণী বিজয়-

কৃষ্ণের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে দিন দিন, শুদ্ধ ও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতে লাগিল। সমাজে যাহা প্রার্থনা করিতেন, তাহার ভিতর সমস্ত প্রাণটি ঢালিয়া দিতেন ও উত্তর পাইবার জন্য বহু বিনিদ্র রজনী তিনি উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে উপহাস করিলেও, উপচীয়মান এই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ একটুকু কমে নাই।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ যদিও জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না, তথাপি পৌত্তলিকতার চিহ্নস্বরূপ উপবীত ধারণ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই বিসদৃশভাব ধরা পড়িল। সত্যের মধ্যে এই অনুদারতা দেখিয়া, তিনি সেদিন বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই, কারণ তিনি চাহিতেন কথা ও কাজের সুদৃঢ় সমতা। প্রকাশ্যভাবে তিনি এই কাজে অগ্রণী হইলেন। ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ধারণের অনাবশ্যকতা বুঝিয়া, তাহা ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে ইহাতে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হইল।

রামতনু লাহিড়ীর পর, বিজয়কৃষ্ণই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি ব্রাহ্মণ এবং গোস্বামী সন্তান হইয়া, সত্যের খাতিরে, উপবীত ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হন্ নাই। অথচ, সেই সত্য বস্তুর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাইয়া, পরবর্ত্তী জীবনে, হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট কাশীতে সন্ন্যাস লইবার সময়, প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক, পুনরায় পৈতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৬৯ সনে শিখাসূত্র-তিলকমালাবিহীন, বিজয়কৃষ্ণ মাতৃচরণ দর্শনাভিলাষে শান্তিপুর আসিলেন।

আজ স্বর্ণময়ী পুত্রের এই ব্রাহ্মভাব দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিজয়কৃষ্ণ চিরদিন মাতৃভক্ত সন্তান। মাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। কিন্তু আজন্মসত্যানুরাগী বিজয়কৃষ্ণ ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত, সত্যকে আশ্রয় করিয়া, তিনি সেদিন সংসারে ও সমাজে যে অপরিসীম লাঞ্ছনা পাইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা এক লজ্জাস্কর কাহিনী। সমাজনেতৃগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ত্যজ্য করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের হিন্দুসমাজ হইতে বিজয়কৃষ্ণ সেদিন নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সত্যের খাতিরে, তাঁহার পক্ষে ইহা কত বড় ত্যাগ, তাহাই আজ মূমুর্ষু জাতির জানিবার ও বুঝিবার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে সুদূর অতীতের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার মৃত্যুতে অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য ঋষিকল্প এই মহাত্মাকেও সেদিন কম দুর্ভোগ ভুগিতে হয় নাই। ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ যখন তাঁহাকে সমাজ-দ্রোহী বলিয়া বর্জ্জন করিলেন, মহর্ষি, তখন আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের বেদীতে দাঁড়াইয়া নির্ভীক ভাবে বলিলেন—"জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, ঈশ্বর আমাকে আরও গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছু চাহিনা।"

হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া বিজয়কৃষ্ণেরও ভিতর

আমরা এই একই দৃঢ়তা দেখিতে পাই। বুঝি সত্যকে এমন ভাবে আঁক্‌ড়িয়া ধরিয়া না রাখিলে ধ্রুব, প্রহ্লাদ সিদ্ধকাম হইতে পারিত না—শ্রীরামচন্দ্রের অবতার নিষ্ফল হইত। বাংলার বহু ভাগ্যে এমন সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষকে আমরা পাইয়াছিলাম। তাই পরিণত জীবনে সত্যের মহিমা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন—"লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে, তাহাতে ক্ষতি হয় না, উপকার হয়। তবে নিজের বিবেকমত না চলিয়া, যদি মনুষ্যের মতে ও আজ্ঞানুসারে ধর্ম্ম করি, তাহাতে হৃদয় স্ফুর্ত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া, নিজের বিবেকমত চলিলে, বিশেষ উপকার হয়। ধর্ম্মের জন্য যাহা ভাল লাগিবে ,তখনই তাহা করিবে। মানুষের দিকে চাহিবে না।"

সেদিন বিজয়কৃষ্ণকে সত্যের এই সর্ব্বনাশী প্রেরণা এমন ভাবেই উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার আকর্ষণে তিনি পৃথিবীর সমস্ত ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন অন্তর্যামী আধঘুমন্ত, আধজাগ্রত অবস্থায় বিচিত্র ভাবে ও রূপে রূপায়িত হইয়া, তাঁহার সমস্ত বৃত্তিগুলি অন্তর্মুখী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, অবসরে, অনবসরে তিনি শুনিতে পাইতেন—"সত্য আমার দিকেই আছে, আমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। আর এই সত্য জয়-যুক্ত হইবেই। পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে প্রীতির উদয় হয় না। প্রীতি না হইলে প্রিয় কার্য্য সাধন করা যায় না। ঈশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার হৃদয় পাষাণ-

ময়। সদা সত্য কথা কহিবে, প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না। পরিহাসছলেও মিথ্যা কহা অনুচিত। একটি মিথ্যা কথা বলিলে যদি রাজ্যলাভ হয়, তাহাও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে। একটি মিথ্যা কথা বলিলে যদি সহস্র সহস্র লোক খড়্গাহস্ত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্যের জন্য প্রাণ দান করিবে, তথাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না"।

ভারতের সাধনার ইহাই নিগূঢ় তথ্য। যুগে যুগে, কল্পে কল্পে,যু গাবতার ও মহাপুরুষগণের তপস্যার ভিতর দিয়া আমরা একদিন এই তত্ত্ব পাইয়াছিলাম যাহার বলে জাতি অমোঘ বীর্য্যশালী হইতে পারিয়াছিল। অতীতের সেই সাধনা, সর্ব্বত্যাগী তপস্যা, আজও কি বিস্মৃতির অন্তরালে মাত্র রূপ-কথার কাহিনী হইয়া থাকিবে? আর উন্মার্গগামী বংশধরগণ দিনের পর দিন সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্ধকারের মধ্যেই আপনার অস্তিত্ব খুঁজিয়া ফিরিবে?

ভবিষ্যতের ভারত ও তাহার জাগ্রত তপস্যার নিকট হইতে ইহার নিঃসংশয় উত্তর পাইবার জন্য সমগ্র জাতি উন্মুখ হইয়া রহিল।

"কেবল রূপের ছটা দেখি এ জগতময়,
আপনা ভুলিয়া হেরি প্রাণমম তুমিময়।
তোমার রূপের কাছে আছে যেই প্রেমরূপ
অনন্ত—অনন্ত তাহা অপরূপ—অপরূপ।
বিশ্বরূপ—প্রাণরূপ, প্রেমরূপ প্রেমময়
সে অরূপ রূপ আমি সদা হেরি তুমিময়।"

ব্যাধি

"The religious life that we must seek will not be one of occasional solemnity and superstitious prohbitions, it will not be sad or ascetic, it will concern itself little with rules of conduct. It will be inspired by a vision of what human life may be, and will be happy with the joy of creation, living in a large free world of initiative and hope. It will love mankind, not for what they are to the outward eye, but for what imagination shows that they have it in them to become."

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধে র্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥

ধ্বংশের মধ্যেই সৃষ্টির বীজটি পরম কৌশলে লুকান থাকে। সাধারণ মানুষ আমরা, তাই সাধারণ স্থূলবুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মকে বুঝিতে চাই। কিছু পাইতে হইলে, কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, লাভের আগে আগে যে ক্ষতি অপচয়ের আবর্ত্ত আছে, ইহা আমরা মানিতে চাহি না। আরোহণের আগে যে অবরোহণ থাকিতে পারে, ইহা তলাইয়া বুঝিতে চাহি না। তাই, চোখের সাম্‌নে যাহা কিছু ধ্বংশ হইতে দেখি, তাহাই পরম অপচয় বলিয়া কাতর হই। সহজেই বিবেক বুদ্ধিহারা হইয়া, ধর্ম্মের পথ দুর্গমবোধে, তাহা সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতে চাই ও সেই সঙ্গে ভুলিয়া যাই—"*No work can be done without some degradation of the possible working capacity of the system of the universe,*" অর্থাৎ, ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের কথায়—"যথার্থ সত্য লাভ কর্‌তে হ'লে সকল প্রকার সংস্কারবর্জ্জিত হ'তে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হ'লে (ধ্বংশ) মনটি একেবারে নির্ম্মল হ'য়ে যায়, তখন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায়ই সত্যের অনুসন্ধান, (সৃষ্টি)। মত, আচরণ, ভাব ও সংস্কার মন হ'তে একেবারে চলে গেলে, যা লাভ হয়, তাহাই

প্রকৃত সত্য। সংস্কারবর্জ্জিত অন্তরে, সত্যের এক কণামাত্র প্রকাশ হলেও, তাহাই অমূল্য।”

এই সংস্কার-বর্জ্জনই ধর্ম্মজগতে ধ্বংশের কথা। সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাপ্তি তাহার পিছনে। কিন্তু ‘দুরত্যয়া মায়া’ মানুষের মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, যাহাতে করিয়া কোন কিছু ত্যাগ করিবার কথা উঠিলেই আমরা হাহাকার করিয়া উঠি। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মজ্জাগত সংস্কারগুলি রক্ষা করিয়া চলি। প্রকৃত সত্য হইতে নিজেকে এইরূপে দূরে দূরে রাখিবার ফলে ভুলিয়া যাই যে—প্রচলিত সমস্ত সংস্কার ও দেশাচার অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়াই সহজ ধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক ও বিকশিত আত্মজ্ঞানের দ্যোতনা।

বাল্যকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণ একটির পর একটি সংস্কার ত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানিয়াছিলেন; ‘ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং’—এই সত্য অনুভব করিয়া ভারতীয় সাধনার কৃষ্টির মধ্যে বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন হৃদয়ের সুনির্ম্মল আধারে, সত্যের সহস্রদল পদ্মটিকে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটাইয়া, তাহার অন্তর-কোষের সঞ্চিত অমৃতপান করিতে ও সকলকে পান করাইতে। তাঁহার সাধনা এই দিব্য প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ ছিল ও তিনি যে সার্থক-তপা হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার জীবন-বেদের পরবর্ত্তি অধ্যয়গুলি পাঠ করিলেই জানিতে পারিব।

তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রে বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে ধর্ম্মার্থ কোন

কঠিন কার্য্যই এই যুবকের অসাধ্য ছিল না। মত ও পথের গণ্ডী কোন দিনই তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। সঙ্কীর্ণতাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া লোকচক্ষে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হওয়ার চেয়ে তিনি মৃত্যুকামনা করিতেন, যেমন কৃষ্ণ-প্রেম-বিহীন ভক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র,—এই দিব্য ভাবে বাংলার নিমাই একদিন নিয়ত উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যখন যাহা সত্য মনে করিয়াছেন, বিনয়, শ্রদ্ধা ও পৌরুষ সহকারে বিজয়কৃষ্ণকে আমরা তখন তাহারই অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি, এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে পূর্ব্ব-সংস্কার বর্জ্জন করিয়া তিনি নবীনকে সাগ্রহে অগ্রণী হইয়া বরণ করিয়া লইতেন।

শান্তিপুর হইতে ফিরিলে, আমরা বিজয়কৃষ্ণকে এইবার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররূপে দেখিতে পাই। গুরু-গিরি ব্যবসা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই তিনি ডাক্তারী শিখিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে ইংরাজী ও বাংলা দুই রকম বিভাগই ছিল। বিজয়কৃষ্ণ বাংলা বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। ইহাতেও সেদিন শান্তিপুরের গোস্বামী-সমাজে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। গোস্বামী-সন্তানের পক্ষে কৌলিক-ব্যবসা ত্যাগ করিয়া এই পথ অবলম্বন দুঃসাধ্য হইলেও মাত্র তাঁহারই পক্ষে সুসাধ্য ছিল। সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এইখানেই শেষ হয়। বিভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ করিলেও তখনও তাঁহারা কৈশোরের পাঁচটি বন্ধু একত্র থাকিতেন। অঘোরনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশ

মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বিজয়কৃষ্ণ, পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও অকপট প্রীতির গুণে, তাঁহারা বন্ধুত্বের এক অভিনব আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে অন্যান্য সদ্‌গুণ অপেক্ষা এই সৌহার্দ্দ্য ভাবটি অধিকতর উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়াছিল। কিন্তু বিশেষত্ব এই, জীবনে তিনি কখনও কোন অবস্থায় বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া অপরকে বিড়ম্বিত করেন নাই। বন্ধুত্বের উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস ও অগাধ নির্ভর ছিল। ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে ও পরে সংসার ও সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি মাত্র বন্ধুত্বের ভিতর সহানুভূতি খুঁজিতেন। বন্ধুর জন্য তিনি কত ত্যাগ, কত দুঃখ স্বীকার করিতেন, আপনার স্নেহ-পক্ষপুটে গৃহ-বিতাড়িত কত বন্ধুকে আশ্রয় দিতেন,—তাহার কাহিনী শুনিবার ও বুঝিবার মত। তাই পরিণত জীবনে বন্ধুগত-প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন—"পুত্র অপেক্ষাও বন্ধু শ্রেষ্ঠ। "পুত্রং পিণ্ড প্রয়োজনাৎ,"—বন্ধু চিরদিনই বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই,—প্রয়োজন নাই। বন্ধুর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তৃপ্তিতে তৃপ্তি। এমন বন্ধু যাহার নাই,—সেই বন্ধুহীন। পূর্ব্বকালে, বন্ধু সকলেরই দুই-একজন অবশ্যই থাকিত। এমন বন্ধু পাওয়া, এখন অতি অসম্ভব। মতে মতে মিলনে বন্ধুতা নহে; এক উদ্দেশ্য, এক প্রয়োজন, এক বাণিজ্য,—ইহা বন্ধুতা নহে। বাস্তবিক বন্ধুলাভ অসম্ভব হইয়াছে। বন্ধু পাওয়া দূরের কথা,—মনের কথা বলিয়া প্রাণ খোলসা করা যায়, এরূপ বিশ্বাসী লোকই দুর্ল্লভ। বিশ্বাস করিয়া অতি গোপনে যাহা

বলিয়াছ,—তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে; তাহা লইয়া উপহাস করিতেছে। ইহা কালের অবস্থা। নিজের মনের সুখ দুঃখ লোকে যদি ব্যক্ত করিতে না পারে, হৃদয় ক্রমে কুটিল হইতে থাকে। কুটিলতা মহা পাপ। লোকে যদি কোন প্রকার সাধন-ভজন না করে, কেবল সরলতার প্রভাবেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। সরল হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট-হৃদয় সহস্র যাগ-যজ্ঞ, সাধন-ভজন করিলেও নরক-গামী হয়। কপট-হৃদয় সর্ব্বদাই অসত্য চর্ব্বন করে; অসত্য রোমন্থন করে। এক বন্ধুহীনতায় এত দুর্গতি।”

কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার পর তাঁহারা পাঁচজনে নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় পূর্ব্বের মতনই যোগদান করিতে লাগিলেন। সমাজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কৃষ্ণ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রার্থনায় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে ও অনতিবিলম্বে প্রকাশ্যভাবে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

শান্তিপুরের গোস্বামী-সন্তান আজ ব্রাহ্ম হইলেন,—এই কথা লিখিতে বসিয়া, তখনকার দিনে, সেই অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে ইহা কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল, তাহা ভাবিতে গেলে, বিস্মিত হইতে হয়। সেই সময় নব্যবঙ্গের সদ্য ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ যে ভাবে খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, অথবা অনেকে যে ভাবে ‘সখের ব্রাহ্ম’ হইতেন, বিজয়কৃষ্ণের মনে ঠিক

তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই। কারণ, তিনি ভাবের আধিক্যে একদিনেই ব্রাহ্ম হইয়া পড়েন নাই। সুদীর্ঘকাল এই ধর্ম্মটিকে চোখের উপর দেখিয়াছেন ; ইহার সংস্পর্শে আসিয়া আচার্য্যের সহিত উপাসনায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ-মন আকুল-করা, অন্তর দিয়া সত্যবস্তু উপলব্ধি করিবার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, মনের স্তরে স্তরে সেগুলি সাজাইয়া পরখ করিয়াছেন, সন্দেহ হইলে আকুলভাবে কাঁদিয়া নিজ প্রার্থনার কষ্ঠিপাথরে তাহা বার বার যাচাই করিয়া লইয়াছেন,—এইরূপে বস্তুতান্ত্রিকতার ভিতর দিয়া, সত্যকে স্বীকার করিয়া তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন।

আলোকমালা পরিশোভিত, সুসজ্জিত প্রার্থনা-গৃহ, বিচিত্র বেশধারী বহু রূপবান যুবক ও রূপবতী যুবতীর সমাবেশ, আচার্য্যের সুদৃশ্য সুউচ্চ বেদী,—বাহিরের এই সমস্ত জিনিষের ভিতর দিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করেন নাই ; বরং যতদিন না ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, অন্তরে অন্তর্যামীর ইঙ্গিত পাইয়াছেন, সমাজ-মন্দিরের দ্বারদেশে ততদিন দাঁড়াইয়া, প্রত্যক্ষ আহ্বানের জন্য ব্যগ্র থাকিতেন। "ভগবানকে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি",—বিজয়কৃষ্ণের এই কথা হইতে তাঁহার তথাকথিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের মর্ম্মকথা বুঝা যায়।

প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য

সাধন করেন, তিনি ব্রাহ্ম। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিব। কি বিদ্যাধ্যয়ন, কি পরিবার প্রতিপালন, কি অর্থোপার্জ্জন, সমুদয় কার্য্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াই সম্পন্ন করিব। যশোমান বিস্তারের জন্য একটি কার্য্যও করিব না। দেবদেবী পূজা করা ও জাতিভেদ স্বীকার করা প্রভৃতি যেরূপ পৌত্তলিকতা, যশোমান ও ইন্দ্রিয়গণের অধীনতাও সেইরূপ পৌত্তলিকতা। সম্পূর্ণরূপে, এই উভয়বিধ পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক হওয়াই, প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া।"

আজ এই প্রসঙ্গে তাই মনে হয় বিজয়কৃষ্ণের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলেই যদি এক ছাঁচের ব্রাহ্ম হইতেন, তবে বুঝি সেদিনকার ব্রাহ্ম-সমাজ রামকৃষ্ণ পরমহংসের সেই লজ্জাস্কর তীব্র সমালোচনা হইতে রক্ষা পাইত। তাই অতীত-যুগের সেই আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, বর্ত্তমানের অধঃপতিত সমাজকে এখনও বুঝি আক্ষেপ করিয়া বলিতে শুনি—"যিনি নিজে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসে আপ্লুত হইয়া, দুঃখ, দৈন্য ও নির্য্যাতন অঙ্গের ভূষণ করিয়া, ব্রাহ্ম-সমাজে অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাস আনিয়াছিলেন এবং জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন, সেই ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ এখন কোথায় ?"

"প্রারম্ভের" শেষ অধ্যায়ে বলিয়াছি যে তখনকার ব্রাহ্মসমাজ পুরাপুরি সংস্কার-মুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। গোড়ার দিকে যতখানি করিরার ছিল রামমোহন রায়ের পর দেবেন্দ্রনাথ তাহা

করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক রচনা কার্য্যে মহর্ষি সকলের চেয়ে সমধিক যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। বাকীটুকু বুঝি বিজয়-কৃষ্ণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মী অনেক ব্রাহ্ম ভ্রাতা ও ব্রাহ্মিকা ভগ্নী মাত্র মুখে জাতিভেদ অস্বীকার করিতেন কিন্তু আচারে সেই অনুরূপ কার্য্য কেহই করিতেন না। এমন কি প্রধান আচার্য্য মহর্ষি পর্য্যন্ত ইহার দলে। আজন্ম সংস্কার-অবিরোধী বিজয়কৃষ্ণের মন ইহাতে ক্ষুব্ধ হইল। "জাতি ভেদ মানিব না, অথচ, তাহার চিহ্ন-স্বরূপ উপবীত ধারণ করিব এবং ভোজনকালে একে অন্যের স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিব না—ইহা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম-সঙ্গত ?" শাশ্বত, সার্ব্বভৌম যে ধর্ম্ম, তাহার আদর্শ এইরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়া, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মের আচরণ যিনি আজীবন করিবেন, তাঁহার পক্ষে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর এই গলদটুকু দেখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব। বন্ধুগণের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন; সকলের কাছ হইতেই প্রতিকূল সমালোচনা শুনিয়া একটু নিরুৎসাহ হইলেন। অবশেষে মহর্ষির কাছে উপবীত-ত্যাগ প্রস্তাব তুলিলে তিনি স্বীয় উপবীত দেখাইয়া বলিলেন—ইহা থাকায় কোন ক্ষতি নাই। মহর্ষি যদিও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম গুরু, তথাপি তিনি তাঁহার এই প্রকার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

উপবীত ধারণ অনাবশ্যক বলিয়া ১২৬৯ সনে বিজয়-কৃষ্ণ প্রকাশ্যভাবে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। সমগ্র হিন্দুসমাজের বুকে সহসা এক বিপুল আলোড়ন তরঙ্গায়িত

হইয়া উঠিল, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে ও শান্তিপুরের গোস্বামী সমাজে।

ইহার পর তাঁহার সহধর্ম্মীগণ একদিন শুনিলেন বিজয়কৃষ্ণ শুধু উপবীত ত্যাগ করেন নাই, একটী নীচ জাতীয়া হিন্দুরমণীর স্পৃষ্ট অন্ন পর্য্যন্ত সকলের সমক্ষে গ্রহণ করিয়া জাতিভেদ-গণ্ডীর বাহিরে আসিয়াছেন। মালাতিলক ও শিখাসূত্র সমন্বিত, বৈষ্ণবব্রাহ্মণ, শান্তিপুরের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবংশের গোস্বামী-সন্তান, অল্প দিনেই উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম ও নব্য দলের অগ্রণী হইলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না, কারণ, সে শিক্ষা তিনি লাভ করেন নাই। ধর্ম্মের আলোকে সত্যবস্তু অখণ্ড ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার আগ্রহ ও ন্যায়ানুগতই যুক্তি, তাঁহার এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মূল। তাই সেই দুর্দ্দিনে, "সোমপ্রকাশের" সম্পাদক সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ নিজে ব্রাহ্ম না হইলেও, স্বাধীনভাবে, প্রকাশ্য পত্রে তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিয়া, উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন—'বিজয়কৃষ্ণ যেরূপ আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়নিষ্ঠা, সত্যানুসরণে চিত্তের একাগ্রতা, হৃদয়স্থ-বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর দেখাইয়াছেন, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।"

বিজয়কৃষ্ণের ভিতরের সমগ্র সত্ত্বাটি সেদিন বুঝি মহর্ষির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই; তাই মহর্ষি জীবনের শেষ অবস্থায়, বিজয়কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ-কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।"

বিজয়কৃষ্ণের এই জয়যুক্ত বিদ্রোহের ভিতর দিয়াই আজ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে যে খণ্ডতা, ক্ষুদ্রতা ও দীনতার সীমা ভাঙ্গিয়া সাধন চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে যখন আত্মশক্তির মধ্যে তুলিয়া ধরিতে পারিব তখনই অজ্ঞানের ক্ষুদ্রতার যত অশুদ্ধ শক্তি তাহারা আমাদিগকে আর নীচে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ভারতীয় সাধনার ইহাই ক্রম-প্রগতি,—যাহার মধ্য দিয়া উপবীত ত্যাগ ও অস্পৃশ্যকে স্পর্শ, এই দুইটি উপলক্ষ্য করিয়া সেদিন বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের শত শক্তি লইয়া, সকল বাধা দীর্ণ করিয়া, পূর্ণতার সকল সিদ্ধির মধ্যে যুগব্যাপী এক উদার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেন। মাত্র এই আদর্শের পূজা করিলেই তাঁহাকে আজ আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়া ভাবে নয়, প্রত্যক্ষেই আবার সম্ভব হইবে।

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
অশোক মন্ত্র তব !
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাওগো জীবন নব !
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব !

জাতি আজ মরিতে বসিয়াছে—শুধু আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া। মরণোন্মুখ এই কোটিপ্রাণে, বিদ্যুৎময়ী চেতনার সঞ্চার যদি আজও প্রয়োজন না হইয়া থাকে, তবে আমাদের অস্তিত্ব আর কয় দিন ? দেশাত্ম-বোধের প্রেরণাই মানুষকে স্বাধীন করে, দীপ্ত করে, জয়যুক্ত করে। ধর্ম্মের জন্য সমাজ, সংসার ত্যাগ করিলেও, বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে দেশাত্ম-বোধ পূর্ণ মাত্রায় ছিল। জাতিকে তিনি সেদিন বাঁচিবার যে অমোঘ-মন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছেন তাহার শেষ কথা হইল—"আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকারই বেশী নয়।" তাঁহার জীবনের যে অধ্যায়ে এই ভাবটি উজ্জ্বলরূপে আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে, তাহাই নূতন করিয়া জাতির মনশ্চক্ষুতে ধরিয়া তুলিতে হইবে,—যাহার ভিতর আমরা বাঁচিবার ও জাতীয়তা রক্ষা করিবার অব্যর্থ সঙ্কেত পাইব।

বিজয়কৃষ্ণ তখন মেডিক্যাল কলেজে মাত্র তিন বৎসর অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার

সুনাম ছিল। অধীত বিষয় তাঁহার স্মৃতিতে সর্ব্বদাই সমুজ্জ্বল থাকিত। চিকিৎসাবিদ্যা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ দুইটি কারণে,—স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জন ও তাহার সহিত পরের উপকার করা। তখন ১২৭০ সাল। বাৎসরিক পরীক্ষার আর মাস কতক বাকী আছে। কোন প্রকার উপাধিভূষিত হইয়া ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার যশস্বী হওয়া বুঝি ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। তাই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিজয়কৃষ্ণ, শেষ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই কলেজের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ, বাঙ্গলা বিভাগের একটি ছাত্রকে বৃথা সন্দেহে চোর অপবাদ দিয়া পুলিশে দেন। শুধু তাহাই নহে, সেই ইংরাজ-পুঙ্গব বাঙ্গালীর জাতীয়তার উপর কটাক্ষ করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে সকল ছাত্রকে অপমানিত করেন। ছাত্রসমাজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ও বিজয়কৃষ্ণকে নেতৃস্থানীয় করিয়া তাহারা একযোগে কলেজ ত্যাগ করিল। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া বিপুল আন্দোলন চলিল, কিন্তু অধ্যক্ষের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য সেদিন একজনও অগ্রসর হয় নাই। যুবক বিজয়কৃষ্ণ একাকী ইহার প্রতিকার মানসে, বিদ্যাসাগরের কাছে আসিলেন। বিদ্যাসাগরের স্বভাবতই একটু ইংরাজ-প্রীতি ছিল, তাই প্রথমে তিনি ছাত্রগণের এই অপমানে সহানুভূতি প্রকাশে বিরত ছিলেন।

উপরন্তু, তিনি এই ব্যাপারে ছাত্রগণকেই দোষী বিবেচনা করিয়া, তাহাদের ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইলে, বিজয়কৃষ্ণ,

বাঙ্গলার সেই আদর্শ সমাজনেতাকে নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন— "শুধু ছাত্র হিসাবে আমরা অপমানিত হইলে আপনার নিকট আসিতাম না। প্রিন্সিপ্যাল আমাদের জাতির উপর কটাক্ষ করিয়াছে; আমাদের জাতির কি একটা মর্য্যাদা নাই?" স্পষ্টভাষী যুবকের এই কথায় বিদ্যাসাগর চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া, বীরসিংহের সুপ্ত-সিংহ সজাগ হইলেন ও স্বভাব-সিদ্ধ দৃঢ়তায় ইহার প্রতিকার মানসে তখনকার ছোটলাট বীড্‌ন সাহেবের নিকট সমস্ত বিষয় লিখিয়া জানাইলেন। সরকারী তদন্তের ফলে, অধ্যক্ষই দোষী সাব্যস্ত হয় ও তিনি ছাত্রগণের নিকট ক্রটী স্বীকার করিয়া, তাঁহার সেই উক্তি পরিহার করিতে বাধ্য হন। সেই হইতে বিজয়কৃষ্ণ সকল অধ্যাপকের আক্রোশ-ভাজন হইয়া রহিলেন। তথাপি, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করিয়া তিনি স্থির হইতে পারেন নাই। অন্যের পক্ষে, সামান্য জ্ঞানে, যাহা তুচ্ছ করা সম্ভবপর হইত, বিজয়কৃষ্ণের কাছে তাহাই ছিল অসহনীয়। মেডিকেল কলেজে পড়া তাঁহার এইরূপেই শেষ হয়।

এই ঘটনায় ভিতর দিয়া বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আসিলেন। একদিকে উপবীতত্যাগী, অ-হিন্দু, ভগবৎবিশ্বাসী ব্রাহ্ম-যুবক বিজয়কৃষ্ণ আর অন্যদিকে, রক্ষণশীল সমাজের আধুনিক নেতা, বিরাটপুরুষ বিদ্যাসাগর,—এই দুইজনের মধ্যে অন্তরের যোগ-সূত্র সুদৃঢ় করাই বুঝি সেদিন বিধাতার ইচ্ছা ছিল। তাই একদা, বিজয়কৃষ্ণের মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনিয়া,

বিদ্যাসাগর একটু অভিভূত হইলেন ; তাঁহার ভিতর ভগবত্তার বিকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মযুবক জিজ্ঞাসা করেন—"লোকে আপনাকে নাস্তিক বলে কেন ? ভগবানের নাম শুনিয়া এমন ভাবে কাহাকেও কাঁদিতে দেখি নাই।" বিদ্যাসাগর বলিলেন—"কি জানি। 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরের কথা লিখি নাই বলিয়া বোধ হয়।" আজন্ম ঈশ্বর-অনুরাগী বিজয়কৃষ্ণ অমনি বলিলেন—"সত্যি, আপনার ওতে ভগবানের নাম গন্ধ নাই। ইহা বড় দুঃখের কথা। সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে যাহাতে একটা বোধ জন্মে, বোধোদয় সেই ভাবেই লিখেছেন্। কিন্তু মানুষের, সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়ের বোধ বেশী আবশ্যক, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নাই।" যুবকের এই কয়েকটি কথাই বিদ্যাসাগরের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণে বোধোদয়ে "ঈশ্বর" বিষয়ক যে প্রবন্ধ বাহির হইল, তাহার মূলে ছিল বিজয়কৃষ্ণের এই দিব্য প্রেরণা। ঐ পুস্তকে বিদ্যাসাগরের যাহা গৌরব, তাহার অনেক খানিই এই ব্রাহ্ম-যুবকের প্রাপ্য ছিল।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার কোন অলক্ষ্য ছিদ্র পথে ভগবানের ইঙ্গিত আসিতে পারে, বিজয়কৃষ্ণ তাহা বুঝিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর কিছুকাল থাকিবার পর, প্রতিনিয়ত তাঁহার মনে হইত,—কিরূপে ইহাকে সর্ব্বব্যাপক করিয়া সমস্ত মানুষের ভিতর নবজাগরণের এই বোধ জাগাইয়া তুলিতে পারা যায়। সমাজ-গৃহের ক্ষুদ্রায়তন স্থান আর স্বল্পসংখ্যক নবধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয়, ইহার প্রসারের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। ধর্ম্ম বৃহৎ বস্তু,—গণ্ডীর

চতুঃসীমার মধ্যে ইহা আবদ্ধ থাকিতে পারে না,—এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ ব্যাপক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি বিস্তর অবকাশ পাইলেন,—আপনার সঙ্কল্পিত ইচ্ছাকে একটি রূপ দিবার জন্য। ভবিষ্যতে যাঁহার প্রাণে প্রেমভক্তির বন্যা বহিবে, আজ তাহার আভাস মাত্র আমরা দেখিলাম। মর্ত্ত্যে প্রকট হইবার পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"আপনি আচরি ভক্তি করিমু প্রচার—" আজ বুঝি বিজয়কৃষ্ণ সেই ভাবেই উদ্বেলিত হইয়া প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন প্রচারক ছিল না, এমন কি, প্রচারের ভাব একমাত্র কেশবচন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু সকল কাজেই যিনি সর্ব্বদা অগ্রণী, তিনি ত "অপরে যে কাজে প্রবৃত্ত হয় নাই, আমি তাহাতে কিরূপে প্রবৃত্ত হইব—" এই চিন্তায় আকুল হইতে পারেন না। বাঙ্‌লার যে মাটিতে অদ্বৈত, নিমাই, নিতাই প্রচার-কার্য্য করিয়া, আচণ্ডালে ভক্তি সঞ্চার করিয়া, নাম-প্রেম-মালা গাঁথিয়া গৃহস্থের প্রতি কুটীর একদা সাজাইয়া গিয়াছেন,—সেই মাটিতে দাঁড়াইয়া শান্তিপুরের বিজয়কৃষ্ণ আজ আবার সেই কার্য্য করিবেন—তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়-নিহিত প্রেম, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের ভিতর দিয়া আজ প্রথম প্রকাশ পাইল। এই প্রচার-ব্রত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন।

তাই মনে হয়, প্রচার কার্য্যের একটী বিশিষ্ট আধার করিয়া ভগবান তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সমগ্র সাধনাই ছিল প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে উৎসৃষ্ট হইয়া তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার ব্রাহ্মসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রকাশ্যভাবে, একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়াইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। শত শত নরনারী সেদিন, মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভগবৎপ্রেম-উচ্ছ্বসিত সেই দিব্যবাণী শুনিয়া শুধু বিস্মিত নয়, পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিল। কলিকাতার বিপুল জনসমাজে এক অভিনব সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা আভিজাত্য শ্রেণীর ছিলেন, তাঁহাদের মহলে বিজয়কৃষ্ণের খুব সুনাম হইল। বিজয়কৃষ্ণের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি জীবন্ত রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিল।

গুণের আদর গুণী যেমন করিতে জানে, জহুরী যেমন হীরা চিনিতে পারে, অন্যে তেমন পারে না। কি উপাদানে এই নবীন ব্রাহ্ম-যুবকটি গঠিত, তাহা সেদিন প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন মাত্র কেশবচন্দ্র। এই সঙ্গত-সভায় প্রিয়দর্শন, মঞ্জুবাক্, কেশবের সহিত প্রথম পরিচিত হইয়া, বিজয়কৃষ্ণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গলায় সেদিন কেশবচন্দ্র না থাকিলে বিজয়কৃষ্ণ ফুটিয়া উঠিতে পারিতেন না। বিজয়কৃষ্ণ না থাকিলে কেশবচন্দ্রের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ। ভবিষ্যতের কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিতে পাই এই দুই মহাপুরুষ, বাঙ্গলার ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, সমাজ কিরূপভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া

নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন—ভারতের সাধনাকে ইহাঁরা দুইজনে বর্ত্তমান যুগোপযোগী রূপ দিয়া, একটি বিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিয়া, বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন—জাতিকে, বিজাতির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য ইহাঁরা জীবনব্যাপী যে সাধনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কতটুকু খোঁজ রাখি ?

'সঙ্গত-সভা' তখনকার ব্রাহ্মদিগের একটি cultural association বা অনুশীলন বৈঠক ছিল। শিক্ষিত ব্রাহ্ম-যুবকগণ এইখানে বসিয়া ধর্ম্ম ও সমাজের সহিত বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন নবভাবে গড়িবার পরিকল্পনা করিতেন। কেশবচন্দ্রের 'অগ্নিমন্ত্রের' সিদ্ধ পীঠস্থান এই সঙ্গত-সভা। সন্ধ্যার সময় বৈঠক বসিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহরব্যাপী—"মৌনং স্বাধ্যায়নং ধ্যানং ধ্যেয়ব্রহ্মানুচিন্তনং। জ্ঞানেনেতি তয়োঃ সম্যগন্তর্দ্দেবস্য দর্শনম্॥" আর, "যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ। যস্মিন্ ব্রহ্মণি রমতেচিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥"—ধর্ম্মের এই সব সূক্ষ্ম গবেষণায় সকলে নিযুক্ত থাকিতেন। বিজয়কৃষ্ণ এই সভার সংস্পর্শে আসিয়া, আরও অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলেন। শান্তির মুক্ত-ধারায় পরিস্নাত হইয়া তৃপ্ত হইলেন।

হৃদয়ে এক অপরিসীম আশা ও বিশ্বাস লইয়া তিনি আবার শান্তিপুরে আসিলেন। আসিবার পূর্ব্বে জননী স্বর্ণময়ীকে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন—"আমি উপবীত ত্যাগী, অ-হিন্দু হইয়া ঘরে ফিরিতেছি, কি ভাবে আমাকে গ্রহণ করিবে, তাহার জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকিও।" আর অপ্রাপ্তযৌবনা

স্ত্রীকে লিখিলেন—“বিবাহের সময় আমি হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলাম। লোকে বলে এখন আমার জাতি গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে যেহেতু আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি ও গলায় পৈতা নাই। এরূপ অবস্থায় তুমি আমার স্বামিত্ব স্বীকার করিতে পারিবে কি?”

সেদিন গৃহে লক্ষ্মীপূজা হইতেছিল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি, “ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং”—এই বলিতে বলিতে বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উৎকণ্ঠিতা মাতা, পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। আর বধূ? স্বামীগতপ্রাণা যোগমায়া, স্বামী কি,—আজও তাহা জানিতে পারেন নাই। বিজয় উপবীত ত্যাগ করিয়াছে, ইহা লোকমুখে শুনিয়াও স্বর্ণময়ী বিশ্বাস করেন নাই। পুত্রের গলায় পৈতা না দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছাপহতা হইয়া ভূমিতে লুটাইলেন। কত দীর্ঘদিন স্বামীস্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, শ্যামসুন্দরকে সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া, এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। আজ তাহাকে এই ভাবে দেখিয়া বিগতদিনের কথাগুলি তাঁহার মনে হইল। বিজয়কৃষ্ণ মায়ের সম্মুখে ধীর, স্থির এবং অবিচলিত।

অনেক করিয়া মাতাকে বুঝাইয়া, শেষ কথা বলিলেন—“আমি আর এই অসত্য ধারণ করিয়া সত্যের অপমান করিতে পারি না। একান্তই যদি অনুরোধ কর, আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন আমার দ্বিতীয় পথ নাই।” তখন সাশ্রুনেত্রে স্বর্ণময়ী বলিলেন—“মনে করিব আমার ছেলের পৈতা হয় নাই—আমি তোমাকে আর অনুরোধ করিব না।” মাতা-পুত্রে এইরূপে আপোষ হইল।

কিন্তু গৃহে তাঁহার স্থান হইল না। পূর্ব্বেই সমাজ হইতে তিনি একবার বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সেই ভয়ে জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল ভাইকে গৃহে লইতে পারিলেন না। "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ"—এই মন্ত্র যাঁহার সারা জীবনের ভরসা ছিল, তিনি ইহাতেও ভীত হইলেন না। তাঁহার ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্র সেদিন বিজয়কৃষ্ণকে আশ্রয় দিয়া সমগ্র বাঙ্গলাকে ভবিষ্যতের এক দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিলেন।

ইহার পর কিছুকাল, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের ভিতর অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত বাস করিয়া, প্রতিকূল ঘটনার সহিত অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া, শান্তিপুরে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী বৈষ্ণবভূমির উপর সগৌরবে উড়াইলেন। তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে কিশোরীলাল সমাজ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতে থাকিলে, উভয়ে শান্তিপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিলেন। বধূ যোগমায়াকে এইবার স্বামীর অনুগমন করিতে দেখিতে পাই।

ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং,
সহ্যেক এক পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাপ্তমুপয়ন্তি ন চ স্থিরত্বম্।

কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম সাধন—সংসার উপেক্ষা করিয়া নয়, সংসারের ভিতর থাকিয়া ধর্ম্ম আচরণ,—ইহাই বাঙ্গালীর তপস্যা। বাঙ্গলার শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, এই তপস্যা করিয়াই সিদ্ধ। বৈরাগ্যযোগ বাঙ্গালীর জন্য নয়, তাই বাঙ্গলার কবিকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া ওঠে,— "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" তাই কর্ম্মযোগের আদর্শ-সাধক বিজয়কৃষ্ণের মুখে পরিণত জীবনে শুনিতে পাই—"যে সকল কর্ম্ম ধর্ম্ম লাভের অনুকূল, তাহাই কর্‌তে হয়। ধর্ম্মের প্রতিকূল কর্ম্মই পাপ। মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে দু'দিনের সাধনায় হয় তো পাপ দূর কর্‌তে পারে; মানুষের পাপ ছাড়্‌বার ক্ষমতাই আছে; কিন্তু কর্ম্ম ছাড়্‌বার ক্ষমতা নাই। কর্ম্ম ক'রেই কর্ম্ম ক্ষয় কর্‌তে হয়। কর্ম্ম না করেও নিস্তার নেই। কর্ম্মটি ধর্ম্মের বাহিরের বিষয় নয়, কর্ম্মই ধর্ম্ম।" ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক হইয়াছিলেন—সে শুধু এই কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্ম-অনুসন্ধান করিবার জন্য। তাঁহার প্রচারক-জীবনের ইহাই মর্ম্মকথা।

এখন হইতে বিজয়কৃষ্ণের প্রচারক জীবন আরম্ভ হইল। এ জীবনের সহিত তুলিত হইতে পারে একমাত্র মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে প্রচারক জীবন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর একদিন সৌভাগ্য হইয়াছিল, কৌপীন বহির্ব্বাস পরিহিত, কমণ্ডলুধারী শ্রীচৈতন্যের নামপ্রচারের সেই বিস্ময়কর অভিযান দেখিবার। অতীতের সেই ছবি,—ভাবাবেশে মহাপ্রভুর ভ্রমণের সেই বিচিত্র চিত্র, কবি আমাদের সম্মুখে এইরূপে ধরিয়াছেন—

"মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ-নাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সদা নিজ গ্রাম ॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥
এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥"

আর আজ বিজয়কৃষ্ণের ভিতর বাঙ্গালী আর একবার সেই অদ্ভুত প্রচারলীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য পাইল। চৈতন্যদেবের মতনই তাঁহার অন্তর্নিহিত যে শক্তি শান্তিপুরে প্রকাশ পায় নাই, আজ হইতে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ব্যাপিয়া, ভারতের সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎবেগে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে লীলায়িত হইয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ণের সমগ্রমূর্ত্তি ইহার মধ্যে সেদিন এমনরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহা বাঙ্গালীর মনে, সংসারে, সমাজে, ধর্ম্মে, অনন্তকাল ধরিয়া ভাস্বর হইয়া, জাতির ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশ করিবে

তখন ১২৭১ সাল। মহানগরী কলিকাতার বুকে তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম, রসে ও ভাবে টলমল করিতেছে। সমগ্র বাঙ্গালা উৎকণ্ঠায় চাহিয়া আছে,—কবে এই স্রোত আসিয়া ইহার পল্লী-কুটীর ভাসাইবে, সমাজের সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর করিয়া, মালিন্যের তিমির-গর্ভ হইতে আর্ত্ত নরনারীগণকে উদ্ধার করিবে। কলিকাতার ক্ষুদ্রায়তন সমাজ-বেদীর শিখর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের রুদ্ধ ধারাকে মুক্ত করিয়া, ভগীরথের মতন বিজয়কৃষ্ণ ইহাকে দিকে দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া চলিলেন। সমাজে দুর্নীতি, সংসারে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা, আচারের নামে চারিদিকে ব্যভিচার, আদর্শচ্যুত শিক্ষাবিহীন নরনারী,—এই সব দেখিয়া কারুণ্যের প্রতিচ্ছবি বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল। সমস্ত আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, পরহিত সাধনার্থে, প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন। সমষ্টির সমগ্র কল্যাণ চিন্তা করিতে গিয়া, নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিবার অবসর আর পাইলেন না।

কেশব সেনের নিকট প্রচার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি প্রথমে কোন্নগর, শ্রীরামপুর ও শান্তিপুর এই কয়েক স্থানে চারি মাস প্রচারকার্য্য করিয়া অসীম সাফল্য লাভ করিলেন। তাহারপর তিনি কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে বাগ-আঁচ্ড়া নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে আসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রামটি নূতন করিয়া গঠন করেন। এই ক্ষুদ্র পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে, জ্ঞানে. ধর্ম্মে, সামাজিকতায়, শিক্ষায় সর্ব্ব প্রকারে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রচার কার্য্যের আদর্শ ছিল অভিনব। তিনি জানিতেন কি করিয়া মানুষ গড়িতে হয়। তাই, শুধু ধর্ম্ম-বক্তৃতা করিয়া ও লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনিয়া বিরত হইতেন না। সমাজের বেদী অপেক্ষা মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বেশী যত্নবান ছিলেন। সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়াই নব-ধর্ম্মের এই জাহ্নবী-ধারাকে তিনি প্রবাহিত করিতেন। যেখানে ইহার অভাব দেখিতেন, তাঁহার প্রথম কাজ ছিল, আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, পরে বীজ বপন। বাগআঁচ্ড়ায় বিজয়কৃষ্ণের প্রচারকার্য্যের বহুমুখী প্রতিভা দেখিতে পাই। জ্ঞান বিস্তারের জন্য স্কুল স্থাপন, ধর্ম্মশিক্ষা, সাধনার জন্য সমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ, রোগীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন, সামাজিক ও পারিবারিক মনোমালিন্য ও কলহ দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা নিবারণ—এতগুলি কাজ তিনি একক করিতেন। কর্ম্ম করিবার কি বিপুল বিদ্যুৎময় আধারই না ভগবান সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। প্রাতে—চিকিৎসা, মধ্যাহ্নে—শিক্ষকতা, রাত্রিতে—নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালনা, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান, শনিবারে সমাজে সমবেত উপাসনা—এই ছিল তাঁহার সেখানকার দৈনিক-কার্য্য তালিকা। অগ্নিময় উৎসাহ, পবিত্র জীবন, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা-শক্তিতে তিনি অনেক লোকের মনে ভগবৎবিশ্বাস ও প্রেম জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রচারকের এমন উচ্চতম আদর্শ সেদিনকার ব্রাহ্মসমাজে একমাত্র বিজয়কৃষ্ণের মধ্যেই দেখা গিয়াছিল।

বাগআঁচ্ড়ায় বিজয়কৃষ্ণের এই অক্ষয় প্রচার-কীর্ত্তিকাহিনী সম্বন্ধে তাঁহারই জনৈক সমসাময়িক ব্রাহ্মভক্তের মুখে শুনিতে পাই—“এইখানে হালদার ও মল্লিক উপাধিধারী কয়েক ঘর পিরালী ব্রাহ্মণকে সাধারণের ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য হইয়া বাস করিতে দেখিয়া, গোস্বামী মহাশয় নিজের স্বাভাবিক প্রেম ও ভক্তিপ্রবণতাগুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের প্রেম ও ভক্তিময় চরিত্র প্রভাবে বাগআঁচ্ড়াবাসী লোকসকল ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পতিত ও অস্পৃশ্য অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল।” ইহাই ছিল ব্রাহ্ম-বিজয়কৃষ্ণের সমগ্র প্রচারক-জীবনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। সকল অবস্থায়, সকল জিনিষের মধ্যে তিনি আগে দেখিতেন সত্যের মর্য্যাদা তাহার পর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ‘সবার উপরে মানুষ, তাহার উপরে কেহ নাই—’ ইহাই ছিল তাঁহার প্রথম জীবনের সাধনা, যাহা তিনি ব্রাহ্ম না হইলেও আচরণ করিতেন। আমাদের কাছে তাই বিজয়-কৃষ্ণ,—আগে অবনমিত মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দান-কারী বিজয়কৃষ্ণ, পরে ব্রাহ্ম ও তাহার আরও পরে হিন্দু বিজয়কৃষ্ণ।

তাই আজ মনে হয়, সাধুতার, একনিষ্ঠতার, ভক্তির ও ঈশ্বরপরায়ণতার যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সকল তিনি পিছনে ফেলিয়া গিয়াছেন,—জাতি গড়িবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট উপাদান। বিস্মৃতির অতল-গর্ভ হইতে সেগুলি বাহির করিয়া জীবনের প্রতি কার্য্যে যদি অনুসরণ করিয়া চলি, তবেই, বাঙ্গালীর

অবসন্ন জীবনে নব-চেতনার সঞ্চার হইবে, তাহার ভাঁটা-পড়া কর্ম্ম ও ধর্ম্মের স্রোতে, স্ফীত, উচ্ছ্বসিত জোয়ারের দুকূল-ডাকা বান ডাকিবে—জাতি বাঁচিবে।

বাগআঁচ্ড়ায় এই প্রকার সাফল্য লাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলে, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে, উপাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া, সম্মান দিয়াছিল। তখনও বেদীর কার্য্য উপবীতধারী উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ ও বেচারাম বাবুর দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। বিজয়কৃষ্ণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া সম্পাদক কেশবচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন—"যদি কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।" তখন প্রধান আচার্য্য মহর্ষির নির্দ্দেশক্রমে, উপবীতহীন অন্নদা চট্টোপাধ্যায় ও বিজয়কৃষ্ণ, উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইলেন। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজ যে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার বীজ এই সংস্কারের ভিতর দিয়া তিনি স্বহস্তে রোপন করিলেন। সত্যের জন্য যে কোন কাজে তিনি কখনও বন্ধুবান্ধবের মতানুপেক্ষী ছিলেন না। সকল বিষয়ে তিনি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে, অপরে তাঁহার পথ প্রদর্শক হয় নাই; বরং এই স্বাধীনচেতা, সত্যকাম যুবক সকলের পথ প্রদর্শক হইয়াছেন। আত্মশক্তির জীবন্ত প্রতীক বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রের এই অগ্নিসংস্কারী-বৃত্তিই, আমাদের বিশেষ করিয়া শিখিবার জিনিষ।

বিজয়কৃষ্ণ বৃত্তিভোগী প্রচারক ছিলেন না। পারিবারিক

অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। একদা, মহর্ষি কর্ত্তৃক উপাচার্য্যের পদে ব্রতী হওয়ার পর, কোন ব্রাহ্মপরিবারে একটী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কাজ করিবার জন্য আহূত হইয়া তাহাদের প্রদত্ত দক্ষিণাস্বরূপ গরদের জোড়, আঙটি ইত্যাদি লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর হিন্দু-ধর্ম্মের পৌরহিত্য প্রভাব বর্ত্তমান দেখিয়া, সেখানকার অনুষ্ঠান-কার্য্য পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। এরূপ দানাদি গ্রহণ করিলে পৌরহিত্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, এইজন্যই মহর্ষিকে দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"যে জীবন ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব?" তখনও তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, ভগ্নী-পতি কিশোরীলালের গৃহে থাকিয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত হইত। তাই কেশবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া মহর্ষি যখন প্রচারকের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন—তখনও দারিদ্র্যের মুখে দাঁড়াইয়া বিজয়কৃষ্ণ ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। "প্রচারের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ হইলেই তাহার সহিত নানাপ্রকার সাংসারিকভাব জড়িত হইবে ও প্রচারে ব্যাঘাত ঘটিবে—" এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি মহর্ষিকে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতে নিরস্ত করেন।

এই ব্যাপারে বিজয়কৃষ্ণকে সকলে আরও ভাল করিয়া চিনিল। আজন্ম ভগবৎ-বিশ্বাসী এই বীর যুবকের কণ্ঠেই সেদিন বাঙ্গালী শুনিল—"মরুক সকলে, শুষ্ক কণ্ঠায়, অনাহারে, রোগ বিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রাণ ত্যাগ করুক,—

আমার শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ব্রাহ্মসমাজকে পোষণ করুক।" কেমন করিয়া মানুষ এমন নির্ভরশীল হইতে পারে? বিংশ-শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিকযুগে আমরা এ কথা ভাবিতে পারি না। কি দৈব প্রেরণায় বিজয়কৃষ্ণ উদ্বুদ্ধ ছিলেন যাহার বলে, তিনি—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—" এই নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ইহা ত কথার কথা নয়, সমাজসংসার-পরিত্যক্ত বিবাহিত যুবকের পক্ষে, ইহা, তাঁহার তখনকার সেই অবস্থায়, কতখানি কঠিন হইয়াও সহজ হইয়াছিল,—তাহাই আজ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। শুধু আজ বলিয়া নহে, পরবর্ত্তি জীবনেও, স্ত্রী, পুত্র, শিষ্য-সম্বলিত বিশাল সংসার লইয়া বিজয়কৃষ্ণের এমনই নির্ভর ছিল যে তিনি বলিতেন—"আমার আকাশ-বৃত্তি—ভগবান যেদিন যেমন দেন, আমি তা'তেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু না দিলেও তাঁরই দয়া মনে করি।" ভোগ-সর্ব্বস্ব জাতি আমরা, ভোগের নাগ-পাশে এমনই আবদ্ধ, নির্ভর করিতে সাহস পাই না, তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া ত্যাগের ঝুলিটি কাঁধে লইয়া পরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারি না। বিজয়কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন জাতিকে ত্যাগের ভিতর দিয়া চলিবার জন্য আহ্বান করিতে। নিঃসাড়, মৃতকল্পজাতি, তখন আকণ্ঠ ভোগের আবর্ত্তে নিমজ্জিত; তাই বুঝি সেদিন তাঁহার আহ্বানে কেহ সাড়া দেয় নাই।

যতই দিন যাইতে লাগিল প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মগণের সহিত নূতন দলের সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ণ অসবর্ণ

বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, একমাত্র কেশব-চন্দ্রই তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি নিজের ভাগিনেয়ীর সহিত কেশবচন্দ্রের এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতির বিবাহ দিলেন। জাতিভেদের গণ্ডী একেবারে ধূলিসাৎ হইল। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বিজয়কৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এইবার মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু সত্যকে যাহা একবার সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তখন তাহার জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে এই বীরপুরুষকে আমরা কোন দিন এত-টুকু পশ্চাৎপদ হইতে দেখি নাই। আজও তাহাই হইল। স্নেহময়ী জননীর অশ্রুধারা, ভ্রাতৃ-প্রেম, বন্ধুগণের অকৃত্রিম অনুরাগ, প্রীতি, যাঁহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিপুল ভালবাসা এবং এই আসন্ন মতভেদও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। প্রাচীন-পন্থীদের লইয়া মহর্ষি পিছনে পড়িয়া রহিলেন, আর নূতনদের লইয়া, কেশব ও বিজয় বিপুল উৎসাহে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে ১২৭১ এর মধ্যভাগে ব্রাহ্মসমাজ দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়।

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
...   .
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভেবে।

১২৭১ সাল। বুধবার, ১৬ই আশ্বিন। আজ সমাজে উপাসনার দিন। বিজয়কৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠার আজ আর একটি পরীক্ষা লইবার জন্যই বুঝি প্রকৃতির বুকে মহাকাল সেদিন তাঁহার সৃষ্টি-নাশা খেলা সুরু করিলেন। পশ্চিম-আকাশের অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি তখনও দুই একটি দেখা যাইতেছে। দিবা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কালোমেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেল। আসন্ন প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি শান্ত, গাছপালা নিথর, নিষ্কম্প। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেই, ঝড়ের প্রবল আলোড়নের সঙ্গে, সমস্ত আকাশ নিঙাড়িয়া, অজস্র ধারায় বৃষ্টি নামিল। প্রলয় তুফানে ধরণী বিভীষিকাময়ী হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্তের বর্ষণে কলিকাতার রাস্তায় এক বুক জল দাঁড়াইয়া গেল। ঝড়, জল ও অন্ধকারে মহানগরীর অস্তিত্ব বুঝি লুপ্ত হইল।

বিজয়কৃষ্ণের সহসা মনে হইল আজ উপাসনার দিন। ভয়ব্যাকুলা পত্নীর অনুরোধ তাঁহাকে সেদিন ঘরের ভিতর রাখিতে পারে নাই। "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"—এই অভয়মন্ত্র

স্মরণ করিয়া সেই তমিস্রাময়ী দুর্য্যোগের রাতে বাহির হইলেন। যাহা দেখিলেন তাহা নিজ মুখে এইরূপে বলিয়াছেন—"আদি-সমাজ ঝড়ে উলট-পালট হইতেছে। কোমর বেঁধে বাহির হইলাম। হ্যালিডে ষ্ট্রীটে গিয়া এক গলা জল—ক্রমে সাঁতার। পথের দুই ধারে মৃতদেহ অগণ্য ভাসিতেছে। সমাজে গিয়া দেখি, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে গিয়াছে—ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কেশব বাবু ও আমি দুই জনে একসঙ্গে উপাসনা কর্‌লাম।"

এমন সত্যানুরাগের ছবি কল্পনায় কেহ ভাবিতে পারে না। 'সেই দুর্য্যোগে ঝড় বৃষ্টি তুফান মাথায় লইয়া, গলা জল সাঁতরাইয়া, আকস্মিক জীবন মরণ সঙ্কটে মৃত্যু স্বীকার করিয়া,' ভগবানের উপাসনা—এ একমাত্র বিজয়কৃষ্ণেরই সাধ্য ছিল।

বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মজীবনের সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই ঘটনাকেই আমরা সকলের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতে চাই শুধু এইজন্য যে, এমন কি এই 'ঝড়ের রাতে' উপাসনার দিন, কেশব-চন্দ্র পর্য্যন্ত একাকী বাহির হইতে সাহস পান নাই। লোক জন লইয়া, পাল্কী চড়িয়া তিনি পথিমধ্যে যখন নগ্নপদে, নগ্ন-মস্তকে আবক্ষ জলের ভিতর দিয়া বিজয়কৃষ্ণকে একাকী উপাসনা মন্দিরের দিকে যাইতে দেখিলেন তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আজিকার এই ব্রাহ্মযুবকের ভিতর সত্যের অনির্ব্বাণ যে আলোক-শিখা জ্বলিয়া উঠিল, তাইতেই ভারতের প্রতি কেন্দ্র একদিন উদ্ভাসিয়া উঠিবে। কেশবচন্দ্রের সেই ভবিষ্যৎ বাণী আজ আবার তাই নূতন করিয়া স্মরণে আনিয়া, বিজয়কৃষ্ণের আজন্ম সত্য-নিষ্ঠাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় ঃ—

"জ্বলিয়া উঠে যদি উঠুক দীপ-শিখা,
প্রতি সে গৃহ-কোণে অরূপ রূপ-রেখা।
সুদূর হ'তে আজি, আসুক সব ভাতি
তাঁরই হাতে হেরি উজল দীপ-লেখা।"

"It is only out of struggle that some, inner power is born, through which we come to realise the essential kinship of all humanity. It is through the eternal interaction of the outer and the inner that the world evolves."

আশ্বিনের ঝড়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, মহর্ষির বসতবাটীর সুবৃহৎ হল-ঘরে উপাসনা হইতে লাগিল। একদিন প্রাতে উপাসনা-গৃহে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণ দেখিলেন যে, উপবীতধারী একজন উপাচার্য্য বেদীর কার্য্য করিতেছে। তিনি আর ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। দ্বারপ্রান্তে গুরু-গম্ভীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহর্ষির অনুরোধেও ভিতরে আসিলেন না। সেখান হইতে তিনি সকলকে প্রার্থনা করিতে বিরত হইতে বলিলেন। নবীনের দল ফিরিয়া আসিল। মতভেদের প্রধূমিত বহ্নি আজ প্রজ্বলিত হইয়া দুই দলকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা করিয়া দিল। প্রাচীন-পন্থীদিগের মতের প্রভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া, মহর্ষি সেদিন বিজয়কৃষ্ণের উপর যে অবিচার করিয়াছিলেন,—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা এক অগৌরবের অধ্যায় বলিয়াই আমরা তাহার বিশদ আলোচনায় নিবৃত্ত হইলাম।

যদিও, 'কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি মহর্ষিদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাই বলিয়া তিনি মহর্ষিদেবের

ধর্ম্মমতের ভিতর নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হন নাই। মহর্ষিদেবের সহিত কেশবচন্দ্রের যখন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজকে পারিবারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র এবং জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ১৮৬৬ সালে মহর্ষিদেবের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ কলুটোলার বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।'

কেশবচন্দ্রের ভরসা ছিল একমাত্র বিজয়কৃষ্ণের উপর, তাই তিনি বিজয়কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ, অঘোরনাথ প্রভৃতি নবীনের দল একে একে সর্ব্বসংস্কার-বিহীন এই নূতন সমাজে যোগদান করিয়া সকলেই ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জীবন অর্পণ করিলেন। বিপুল উৎসাহে বিজয়-কৃষ্ণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। চারিদিকে ভাব প্রচার করিবার জন্য, কেশব ও বিজয়ের অগ্নিগর্ভ বাণী লইয়া, "ধর্ম্মতত্ত্ব" বাহির হইল। কিছু দিন মাসিক থাকিয়া পরে ইহা পাক্ষিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

এইবার নবীনদল প্রচার কার্য্যে নামিলেন। ১২৭১ সালের শেষভাগে বিজয়কৃষ্ণ অঘোরনাথকে লইয়া প্রথমে ঢাকায় আসিলেন। তখন ঢাকার উদ্যোগী ব্রাহ্মগণ একটি ব্রাহ্মস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অঘোরনাথ এই স্কুলে মাসিক ২০৲ বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের উচ্চ উপাধিধারী ছাত্র, সামান্য বেতনে কাজ স্বীকার করিয়া,

ঢাকার শিক্ষিত সমাজকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন। বন্ধুর আদর্শ চরিত্রখানি সম্মুখে রাখিয়া অঘোরনাথ স্বীয় জীবনখানি এমনই অপূর্ব্ব ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ শিক্ষার জিনিষ। ত্যাগ-হিতসর্ব্বস্ব, অক্লান্ত কর্ম্মা অঘোরনাথ, বিজয়-কৃষ্ণের প্রচারক জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত, সকল সময় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। তাই মনে হয়, একা বিজয়কৃষ্ণ অনেকাংশেই অপূর্ণ,—অঘোরনাথ, কেশবচন্দ্র, কিশোরী লাল, নগেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় এতগুলি একত্র হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ও সার্থক-জীবন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ঢাকা বিজয়কৃষ্ণের প্রচার-কেন্দ্র। তাঁহার প্রচার-তপস্যার সিদ্ধ পীঠস্থান,—এই ঢাকা। পদ্মার বিস্তীর্ণ উপকূলে দাঁড়াইয়া, তিনি ব্রহ্মের অনন্ততত্ত্ব উপলব্ধি করিতেন। তাই সাধন জীবনের পরিণত অবস্থায়, আমরা তাঁহাকে ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে সমাধি-মগ্ন দেখিতে পাই। ঢাকায় আসিতেই এমনই এক উৎসাহের বন্যা বহিল, যে সমস্ত নরনারী ব্রাহ্ম হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিল। লব্ধ-কীর্ত্তি, ঢাকার অন্যতম ব্রাহ্ম নেতা ব্রজসুন্দর মিত্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি তখন কুমিল্লায় কার্য্য ব্যপদেশে থাকিতেন। তাঁহারই ঢাকার আরমানীটোলার সুবৃহৎ বাড়ীখানি, বিজয়কৃষ্ণের প্রথম প্রচারক-নিবাস হইল।

প্রতিদিন অক্লান্ত ভাবে তিনি বক্তৃতা করিতেন। তখনও আজকালের মত যাওয়া আসার এত সুবিধা ছিল না। এক একদিন আট-দশক্রোশ পথ পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া প্রচার

করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুধু ধর্ম্মের নীরস ও মামুলি কথা মাত্র ছিল না। মানুষকে তিনি সমগ্র ভাবে দেখিতেন। তাই বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা ছিল সর্ব্বব্যাপী। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, নীতি, চরিত্র ও ধর্ম্ম,—এই সব জিনিষের ভিতর দিয়া তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিতেন। মানুষের ভিতর ও বাহির দুইদিকই বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতেন।

এই রকম একদিনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে, ধর্ম্ম ও নীতির সহজ কথা তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর কাণে 'মহাসিন্ধুর ওপার হোতে কি সঙ্গীত ভেসে আসার মতন', আজও ঝঙ্কারিয়া ওঠে—"ধর্ম্মকে জীবনে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন না করিলে, উহা কখনও টেকে না, বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝিব? যেমন আগুনের ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম্ম শীতলতা, ধর্ম্মও সেইরূপ মানবের স্বভাব। যাহা সভ্য, অসভ্য, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, শিশু ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে সাধারণ ভাবে আছে, তাহা মানবের স্বাভাবিক গুণ। এই গুণ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা। এই তিন গুণের উৎকর্ষ সাধনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য—ইহাই মানবের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সত্যবস্তু,—যে সত্য সর্ব্বসাধারণের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহাতে ব্যক্তি বিশেষেরও মতবিরোধ নাই, যাহা সকলের পক্ষেই সত্য, তাহাই মানব প্রকৃতির ভোগ্য—স্বভাবের সত্য।

"নীতি কি? সত্য কথা বলা, কারও অপকার না করা, অশ্লীল ও অনিষ্টকর ব্যবহার হইতে বিরত থাকা—তাহাই সাধারণ নীতি। এই সাধারণ নীতি সর্ব্ববাদী সম্মত। প্রাকৃতিক ও মানবজাতির স্বাভাবিক নীতি—ইহা সকলেরই পালনীয়। ইহা ভিন্ন আরও অন্যপ্রকারের নীতি আছে। তাহা দেশ-ভেদে, কালভেদে ও পাত্রভেদে কখনও আবশ্যক হয়, আবার কখনও বা হয় না। এই নীতি সকল স্থানে সমান নয়। দেশ ভেদে নীতি এদেশে আছে, অন্য দেশে নাই; কালভেদে নীতি আজ আছে, কাল নাই; আবার পাত্রভেদে নীতি আমার পক্ষে আছে, তোমার পক্ষে নাই। কিন্তু সহজ ধর্ম্মনীতি যাহা দেশ-কাল-পাত্রভেদ হয় নাই, তাহা সর্ব্বত্র চিরকালই একভাবে আছে। যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার তাহাই ধর্ম্ম, তাহার তাহাই অবশ্য পালনীয়।"

ইহার পর বিজয়কৃষ্ণকে আমরা দেখিতে পাই কখনও মৈমনসিংহ, কখনও বরিশাল, আবার কখনও বা কুমিল্লায়। সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ তিনি উল্কার বেগে ছুটিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। দিনদিন নবনব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নব-নব ভাবময়ী, মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় সহস্র সহস্র লোকের মনে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। প্রাচীন-পন্থী ও রক্ষনশীল হিন্দুসমাজের সহিত ঢাকার নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। 'হিতরক্ষিনী-সভা' তীব্র আলোচনায় আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। প্রচার-ব্রতে তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণভাবে বাড়িল। এইরূপ অবিরাম

সংগ্রামরত ব্রতী একক হইয়া সেদিন ব্রাহ্মসমাজের গৌরব কিরূপ অম্লান রাখিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা হইতে লিখিত কেশব সেনের এক পত্রে আভাষ মাত্র দেখিতে পাই। কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন—"জয় জয় বিজয়ের জয়। তুমি যে জয়পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আসিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জ্বলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আবার বলি জয় জয়।"

তখনকার "তত্ত্বকৌমুদী" বিজয়কৃষ্ণের প্রচার-লীলা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—"জ্বলন্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎকৃপা সহায় করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ষার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরি তরঙ্গিনী যেমন প্রবল বেগে উভয়কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমুচ্ছ্বসিত প্রাণ, বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্ম নামে সেইরূপ দেশ দেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। প্রভেদ এই, গিরিনদী উভয়কূলের চিরসঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি ধৌত করিতে যাইয়া মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ দেশের পাপ কুসংস্কার দূর করিতে যাইয়া স্বয়ং নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ, প্রেমোদ্দীপ্ত একত্বময় জীবন্তপ্রাণের মহাপ্রচার দর্শন করিয়া, লোকে মুগ্ধ হইল; তাঁহার অনলবর্ষি, মর্ম্মস্পর্শি, অমৃতোপম মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া সকলের প্রাণ-জাগ্রত ও মন শীতল হইল।

"বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গদূতের ন্যায় প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় নামিলেন। 'যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ, ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান।' যেমন কথা তেমনি কাজ। দেহমন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' মহামন্ত্র সার করিয়া, প্রভুর চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, প্রভুর মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্য্যে তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবসর ছিল না। তিনি আপনার শরীরের প্রতি দৃকপাত করিলেন না। পরিজনের সুবিধা, অসুবিধা, সুখস্বচ্ছন্দতার পানেও চাহিলেন না; এবং নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে, পূর্ণপ্রাণে প্রভুর কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাঙ্মুখী হইল।"

এই সময় অর্থাভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-কার্য্য একটু মন্দগতি হইয়া পড়ে। কেশব সেনের উপর সমস্ত ব্রতিগণের পরিবারবর্গ ভরণপোষণের দায়িত্ব। কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মনেতার পরামর্শে একটি 'ফাণ্ড' খোলা হইল। ঢাকার ব্রজসুন্দর মিত্রের দান ইহাতে সকলের চেয়ে বেশী ছিল।

এক বৎসর পরে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে আসিয়া কঠিন জ্বরে কিছুকাল ভুগিতে থাকেন। দেহের উপর ইহা কঠিন পরিশ্রমের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আরোগ্যলাভ করিয়া কলিকাতা ফিরিলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে নির্দ্ধারিত যে বৃত্তি পাইতেন তাহা অতঃপর লইতে অস্বীকার করেন। ঢাকায় আসিয়া

চিকিৎসাবিদ্যা আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ একজন কৃতবিদ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া সেখানে পরিগণিত হইলেন ও তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। প্রচারের গুরুভার দায়িত্ব ভগবান যাঁহার মস্তকে চাপাইয়া দিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এই সব কাজ বিড়ম্বনা মাত্র। বৃত্তি যাঁহার আজন্ম ত্যাগমুখী, ভোগের দিকে তাঁহাকে টানিবে কে ?

১২৭২ সালের মধ্যভাগে কেশবচন্দ্রকে লইয়া, ফরিদপুর, নোয়াখালী ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি পূর্ব্ববঙ্গের সহরগুলিতে বিজয়কৃষ্ণ দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া আমরা এইবার বধূ যোগমায়ার গৃহস্থালী দেখিতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছি।

যোগমায়া এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের অপূর্ব্ব শ্রী ও লাবণ্যে তাঁহার সুকোমল তনুখানি বিকশিত হইয়াছে। বালিকা-সুলভ চপলতা নাই, বর্ষার নবমেঘ-সঞ্চারী ছায়ায় মন সমাচ্ছন্ন, অন্তর্ঘন-রসে হৃদয় পরিপূর্ণ। সমাজ ও সংসার-ত্যক্ত স্বামীর অনুগমন করিয়া, কলিকাতায় তিনি কিছুকাল ননদের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে বাল্যাবধি বাস করিয়াও যোগমায়ার অন্তরটি ছিল, পরিস্কার, স্বচ্ছ ; কোন রকম সংস্কার সেখানে রেখাপাত করিতে পারে নাই। স্বামীর বন্ধু নগেন্দ্রনাথের হস্তে তাঁহার প্রথম শিক্ষাভার অর্পিত হয়। নিঃসঙ্কোচে, স্বামীর নির্দ্দেশে অপরিচিত অনাত্মীয় যুবকের সম্মুখে বাহির হইতে, যোগমায়া কুণ্ঠিত হন নাই।

কলিকাতায় থাকিবার সময়, প্রচারকার্য্যের অবসরে যখন সময় পাইতেন, বিজয়কৃষ্ণ, যোগমায়ার অন্তরের আবরণ ধীরে ধীরে উন্মোচন করিয়া সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। সত্ত্বগুণময়ী, তপস্বিনীর আধার বুঝি ভগবান পূর্ব্ব হইতেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামীর প্রাণের কথা, মনের ভাব, হৃদয়ের আনুভূতি,—সমস্তই সেখানে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। স্বামীর ভিতর এক দিব্য জিনিষের নিত্য স্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে অভিভূতা হইতেন। পতির পাশে নিদ্রিতা হইয়া কত রজনীতে তিনি স্বামীর ভিতর দিয়া জগত-স্বামীকে অনুভব করিতেন। সমস্ত বাসনা কামনার স্বাভাবিক তরঙ্গ হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া, পর-মুহূর্ত্তে কোথায় নিস্তরঙ্গ হইয়া পড়িত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। প্রকৃতপক্ষে, যোগমায়ার গৃহস্থালী তখন তাঁহার জননী মুক্তকেশীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ভারতীয় সাধনার মূর্ত্তিময়ী সিদ্ধি, যোগমায়া তখন বুঝি.—

"জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ, ভক্তিনারায়ণে,
সকল ধর্ম্মের সার রাখিও স্মরণে।"—

এই আদর্শেই অনুপ্রাণিতা ছিলেন আর, 'নারী-জীবনের সার্থকতাই হইতেছে—পুরুষের ইচ্ছাকে সার্থক করা, তাহার মুক্তি-ব্রতের সহকারিণী' হওয়া, এবং 'স্বামীর সহিত সংযুক্ত-জীবনের মধু আস্বাদে অমৃতময়ী' হওয়া—এই সহজ জ্ঞানের ভিতর দিয়া সেই আদর্শকে নিজের সিদ্ধ-জীবনে বিজয়কৃষ্ণের মতনই একটি মনোহর রূপ দান করিয়া গিয়াছেন।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্মজ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই ধর্ম্মের স্থিতি; বিভিন্ন ভাবের সাধনা করিয়া, ধর্ম্মকে 'অস্তি প্রাপ্তি ও নেতি নেতির' দুর্গমের পথ হইতে আনিয়া, সংসারের নিত্যকার সুখ দুঃখের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়ার যে কল-কৌশল তাহা মাত্র বাঙ্গালীর তপস্যার অন্তর্গত জিনিষ। শাস্ত্রের রচা কথা ও প্রদর্শিত পথ প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া সহজভাবে না পাওয়া পর্য্যন্ত, বাঙ্গলার ভাব-সিদ্ধ মহাপুরুষগণ তাহা হইতে দূরে দূরে চলিয়াছেন। ক্রমবিকাশের সোপান বাহিয়াই তাঁহারা পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেন।

আত্ম-অবদানের পরিপূর্ণ পুলকে বিজয়কৃষ্ণের সাধনা চির উজ্জ্বল,—আলোকের সাহায্যে তাহাকে স্ফুট করিয়া দেখাইতে হয় না। বাঙ্গালীর চক্ষে তাহা সহজেই প্রতিভাত হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনের সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত, লক্ষ্যের দূরত্ব যতই ধাপে ধাপে কমিতে থাকে, ততই মহাস্রষ্টার লীলা-কমল সার্থকতার শতদল মেলিয়া তাঁহার অন্তরে বিচিত্ররূপে, বর্ণে ও গন্ধে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাই।

তান লয় সুরে বাঁধা তাঁহার সমগ্র জীবনখানি যেন একটি ছন্দের একতারা।

পুরাতন সমাজীগণ ও তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য মহর্ষির সহিত মতভেদ ঘটিলেও, বিজয়কৃষ্ণ সকলের সহিত আগের মতন সখ্যভাবে চলিতেন। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য এইখানে। কার্য্যগত মত-দ্বৈধ ঘটিলেই যে অন্তরের যোগ-সূত্র ছিন্ন হইবে, ইহা কখনও তিনি মানিতেন না। কিন্তু, সকলেই ত আর বিজয়কৃষ্ণ নহেন,—তাই এই নূতন ও পুরাতন সমাজের মনোমালিন্য দিনের পর দিন বাড়িয়া এমন অশান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিল, যাহার মধ্যে চিরশান্তিপ্রিয় বিজয়কৃষ্ণ থাকিতে অসহ্যবোধ করিলেন। কলিকাতায় থাকিলে ইহার মধ্যে যোগদান করা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কার সমর্থন করিয়া, প্রতিপক্ষ আদিব্রাহ্ম সমাজকে তীব্র সমালোচনায় নিরস্ত রাখার কার্য্যে যোগদান অনিবার্য্য ভাবিয়া, বিজয়কৃষ্ণ কিছুকাল শান্তিপুরে আসিয়া বাস করা বিধেয় মনে করিলেন। এইরূপ ঝগড়া বিবাদের শুষ্কতার মধ্যে থাকিয়া তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন।

দ্বিতীয় কথা, কাহারও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, বিজয়কৃষ্ণের চরিত্র বহির্ভূত রীতি। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে যাহাই হউক, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, ভগবান তাঁহার প্রিয় যন্ত্রটির ভিতর হইতে, ভক্তির অনাহত সুর ঝঙ্কারিয়া তুলিবার জন্য অলক্ষ্যে বসিয়া এক লীলার ভিতর দিয়া পাঁচ সাত রকমের

কাজ করিবার নিঃশব্দ আয়োজন করিতেছিলেন। ইহাই হইল ভিতরের রহস্য—অব্যক্ত মর্ম্ম।

প্রচারক অবস্থায়, বিজয়কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে আসিতেন, সেই অবসরে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। তাঁহার নিজের কথায় সেই কথা বলি—"প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মাঠাকুরাণীকে দেখ্‌তে আমি বাড়ী আস্‌তাম। একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বল্‌লেন—'ত্যাখ্ আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, আর জল দেয় নাই।' আমি অমনই খুড়ীমাকে ডেকে বল্‌লাম, 'খুড়ীমা! তোমাদের শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাও নাই।' খুড়ীমা আমাকে বল্‌লেন, 'হাঁ শ্যামসুন্দর ত আর লোক পেলেন না; তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কি না, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয় নাই। আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা অনুসন্ধান ক'রে দেখ না।' খুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জান্‌লেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময় অনেক কথা বল্‌তেন। শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখে আসছি; আমি না মান্‌লেও তিনি আমাকে কখনও ছাড়েন নাই। আর একদিন সন্ধ্যায়, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম, শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখে আমাকে বল্‌লেন, 'ওরে একবার দেখে যা না, চূড়ো পরে আমি কেমন সেজেছি।' 'আমি বললাম, 'আমি আর কি দেখব, আমি ত আর তোমাকে মানি না।' শ্যামসুন্দর বললেন, 'তাতে আর কি, নাই বা মান্‌লি, একবার দেখ্‌তেও কি দোষ?'

পরে আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে, তাঁর স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বলরূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়্‌লাম। শ্যামসুন্দর একটু হেঁসে বললেন, 'একি তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস না ?' আমি বল্‌লাম, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘুরালে কেন ? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করে ছিলে কেন ?' শ্যামসুন্দর বললেন, 'তাতে আর দোষ কি ? ভেঙ্গেও ছিলাম আমি এখন আবার গ'ড়েও নিচ্ছি আমি ; তোর তাতে আর কি হ'য়েছে ? ভেঙ্গে গড়লে আরও কত সুন্দর হয় জানিস্ ?"

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণকেও আমরা একদিন এই ভাবে তাঁহার 'মা'য়ের সহিত কথা বলিতে শুনিয়াছি। ইহা কি তাঁহারা মাত্র কল্পনায় সম্ভোগ করিতেন ? বিংশ-শতাব্দীর নাস্তিকতার যুগেই আমাদের ইহার তত্ত্ব বুঝিয়া লইতে হইবে ; তাহা নহিলে, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অন্ধ-ভক্তির মধ্যে ইহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিলে, পাশ্চাত্যের অপ্রত্যক্ষীভূত ও অসার্থক অধ্যাত্মবাদ আমাদের অজ্ঞাতে মনের মধ্যে আসিয়া, এমনই বিকৃত ভাব জাগাইয়া তুলিবে, যাহার প্রভাবে হয় ত আমরাই কোন দিন স্বীকার করিব—

"*Reverence and worship, the sense of an obligation to mankind, the feelings of imperativeness acting under orders which traditional religion has interpreted as Divine inspiration, all being to the life of the Spirit. And deeper*

than all these lies the sense of a mystery half revealed, of a hidden wisdom and glory, of a transfiguring vision, in which common thing lose their solid importance and become a thin veil behind which the ultimate truth of the world is deemly seen. It is such things that are the source of religion." ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার চূড়ান্ত ইহার চেয়ে আর বেশী হইতে পারে না।

ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য ছিল ইহারই প্রভাব হইতে আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানকে বাঁচাইয়া রাখা ও সেই সাধনায় সিদ্ধ বাঙ্গালীর রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাগবৎ জীবনের এমন জীবন্ত আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া জীবনের প্রতি কার্য্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই, জাতি তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, এই সব উৎকট ভাব হইতে নিজকে নির্ম্মুক্ত রাখিতে পারিবে।

জীবনের প্রথম অবস্থায় আমাদের দরকার নীতি ও চরিত্র রক্ষা করা, সাকার বিগ্রহে বিশ্বাস থাক আর নাই থাক। সহজ ও স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ এই সময় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। "ব্রহ্মজ্ঞানটি না হ'লে কোন প্রকারের ঠিক তত্ত্ব জানবার অধিকারই হয় না। এজন্য ঋষিরা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সত্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, মঙ্গলময়, নির্ব্বিকার, নিরাকার ইত্যাদি ভাব সকল ধ্যান করতে করতে, যখন ক্রমে ক্রমে উহার ভিতর দিয়া অলৌকিক রূপের

আশ্চর্য্য ছটা প্রকাশ হতে থাকে, তখনই উহা ধীরে ধীরে বুঝা যায়, ধরা যায়।'

তাহার পর দেবতার ভাব ও রূপ মনে আসার কথা। কল্পনা না করিলেও এইরূপ হয় কেন? "যাঁর যে কুল-দেবতা, তাঁর ভেতরে সেই দেবতারই রূপ ও ভাব এসে পড়ে। পিতৃ পিতামহাদি বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে যে সকল ভাব, রক্ত ও মাংসের সহিত আমাদের ভিতর জড়িয়ে রয়েছে, উহা কি সহজেই যায়? ব্রহ্মোপাসক হলে কি হবে? ব্রহ্ম যখন প্রকাশিত হবেন, তখন একটা ভাবে, একটা রূপে, তো প্রকাশ হবেন। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাঁর বংশের যে দেবতা, ব্রহ্ম তাঁর নিকটে সেই রূপেই প্রথম প্রকাশ হন।" রূপ প্রকাশ পাইল। ভাব প্রকাশ পাইল। সাকার মৃণ্ময় বিগ্রহের ভিতর দিয়া রূপ ও ভাবের বিলাস রসঘনমাধুর্য্যে এক সঙ্গে যখন ফুটিয়া ওঠে তখনই তিনি চিন্ময় সচ্চিদানন্দ তনু লইয়া ভক্তের নিকট অখিলরসামৃত মূর্ত্তিতে ধরা দেন এবং তাহার রসে রসিয়া ওঠেন,—মাটির দেবতা মানুষের মত কথা বলেন ও শোনেন। ইহাই হইল বিজয়কৃষ্ণের শ্যামসুন্দরের সহিত ও রামকৃষ্ণের 'মায়ের' সহিত কথা কওয়ার তথ্য, যাহা দেখিয়া সহজেই মনে হয়—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হোতে অসীমের মাঝে হারা।

প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হোতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

ভগবানের এখন প্রয়োজন হইয়াছে বিজয়কৃষ্ণের বিশুদ্ধ আধারটির ভিতর ভক্তি উজ্জীবিত করিয়া তোলা—তাঁহার সেই নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য, কলিকাতার অশান্তিপূর্ণ কোলাহল হইতে প্রিয় ভক্তকে একটু নিভৃত নির্জ্জনে লইয়া আসা। তাই বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে আসিলেন।

- সেইসময় হরিহর প্রামাণিক নামে এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাপুরুষ এখানে বাস করিতেন। একদিন সেই মহাত্মাকে, ভক্তি কিসে হয়—ইহা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বিজয়কৃষ্ণকে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়িতে বলিলেন। 'চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু, কর্ণমন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু'—বিজয়কৃষ্ণ সেই গ্রন্থে বুঝি এক নূতন জিনিষের ইঙ্গিত পাইলেন—নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার স্বচ্ছ আত্মদৃষ্টি জন্মিল। "জীবে দয়া, নামে ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করায়, বাহিরের ধর্ম্মানুষ্ঠান যে পরলোকের সম্বল নহে, কেবল দয়াময়ের অভয় চরণই সম্বল—তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।"

গৌরলীলার সিদ্ধপীঠ নবদ্বীপ তাঁহাকে এইবার আকর্ষণ করিল। নাম ও প্রেমের নিভৃত নিকুঞ্জে তিনি ছুটিয়া আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির সংলগ্ন একটি সাধারণ কুটিরে, লোক-চক্ষুর অজ্ঞাতে তখন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী এইখানে বাস করিতেন।

এই মহাত্মাকে দেখিয়া তাঁহার যেরূপ ভাব হইল নিজমুখে বিজয়-কৃষ্ণ তাহা বলিয়াছেন,—"বাবাজীর নিষ্কিঞ্চন ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও ভক্তিভাব দেখে বড়ই আনন্দ হলো। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার কর্‌তেন। ছেঁড়া কাঁথা, নারিকেল মালা ও একটি মাটির করোয়া ভিন্ন, বাবাজীর আর কিছুই সম্পত্তি ছিল না। আমি বাবাজীর নিকট কিছু সময় বসে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'বাবাজী ভক্তি কিসে হয় ? বাবাজী আমার প্রশ্নর কোনও উত্তর না দিয়ে, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থেকে থর থর করে কাঁপ্‌তে লাগলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরটি পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হতে লাগ্‌ল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। বাবাজী অস্ফুট স্বরে একটি গভীর হুঙ্কার করে বল্‌লেন, 'কি বল্‌লে গোঁসাই ? তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয় ? তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয় !! য়্যাঁ, তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয় !!' এই বলেই সমাধিস্থ হলেন। তিনঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। সে সময়ে বাবাজীর শরীরে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখে, আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী, সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, করজোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল হতে পারি। তা না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তির নাম গন্ধও নাই। এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, আমি পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি। ভক্তি ত আপনারই ভাণ্ডারের জিনিষ, আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির অভাব আছে।"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ ব্রহ্মজ্ঞানী বিজয়কৃষ্ণ এই কথা শুনিলেন। তাঁহার বিচিত্র জীবন-দৃশ্য-কাব্যের একটি দৃশ্য, সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া দূর ভবিষ্যতকে অনবদ্যরূপে বর্ত্তমানে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে রূপায়িত করিয়া তুলিল। সিদ্ধ-পুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছিল, তাহা যথাকালে আমরা আলোচনা করিব। বাবাজীর এই কথা, বিজয়কৃষ্ণ সেদিন কতখানি বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানিনা, তবে ইহা জানি যে, তাঁহার সেই কথায় ব্রহ্মজ্ঞানীর আর একটি হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে আর একটি দিব্য জগতের সন্ধানে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। অলক্ষ্যে তাঁহার প্রাণ-পুরুষ সুপ্তোত্থিতের মত বলিয়া উঠিল—

"ন ধনং ন জনং সুন্দরী, কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"
"ধন জন নাহি মাগি কবিতা সুন্দরী
শুদ্ধ ভক্তি দাও মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি।"

আজ বিজয়কৃষ্ণ, তাঁহার বিগত প্রচারক জীবনের এইরূপ আর একটি ঘটনা মনে করিয়া ও উভয়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া কিছুকাল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে পড়িল,—কাল্‌নায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা, যিনি তাঁহাকে একদা বলিয়াছিলেন—"জাতকুল থাকৃতে কি কখনও ভক্তি লাভ হয়?"

মনে এক অপূর্ব্ব ভাব লইয়া তিনি শান্তিপুরে ফিরিলেন। একদিন পূর্ণিমা রজনীতে গঙ্গার তীরে আসিয়া বসিলেন।

তখন বসন্তকাল। তিনি বসিয়া বসিয়া আত্ম-চিন্তা করিতে লাগিলেন। সম্মুখে গঙ্গার লহরী নাচিতেছে। কৌমুদী-ধারায় আকাশ ও পৃথিবী প্লাবিত। স্নিগ্ধ বাতাস সদ্য-ফোটা ফুলের সুরভি-স্নাত হইয়া বহিতেছে। জীবজগৎ সুপ্ত। প্রকৃতি শান্ত, মৌন, এবং পুরুষের ধ্যানে সমাহিত। এই উপযুক্ত অবসরে, বাঙ্‌লার ভাবী ভক্ত-বীরের হৃদয়ে, ভক্তিদেবী ধীরে ধীরে জাগিতেছেন। সমস্ত পৃথিবী ভুলিয়া বিজয়কৃষ্ণ আত্ম-ধ্যানে নিমগ্ন। ভক্তির সিদ্ধবীজ তাঁহার শুদ্ধ অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন—"ভক্তি ও প্রেম বিনা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই। কি তুচ্ছ ভাব লইয়া মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতেছে।"

আজিকার এই ব্রহ্মজ্ঞানীর ভিতর ভক্তির এই আভাস, তাঁহার সাধন-জীবনের পরিণত অবস্থায় কিরূপভাবে বিলসিত হইয়া, বিজয়কৃষ্ণকে ভক্তির চরমে আনিয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথায় এইরূপে পাই—"নিজেকে অভক্ত, দীন, হীন, কাঙ্গাল মনে করে যদি ভগবানের চরণে পড়ে (থাকা যায়), তা হলে ভক্তিদেবী অবশ্যই কৃপা করবেন্। কিন্তু আমি ভক্ত,—এই অভিমান যেখানে, ভক্তি-দেবী সেখানে গমন করেন না। যাহা দ্বারা ভগবানকে ভজনা করা যায় তাহাই ভক্তি।

সেরাত্রি তাঁহার আত্ম-চিন্তায় অতিবাহিত হইল। অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব এক দিব্য জিনিষ পাইয়া তিনি শান্ত হইলেন। ঘোর শুষ্কতার পর এই নব ভক্তি-ধারা তাঁহার চিত্তকে স্নিগ্ধতায়

অভিষিক্ত করিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর এই ভাব জাগাইয়া তুলিবার উদগ্র প্রেরণায় বিজয়কৃষ্ণকে অনতিবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিতে হইল; কারণ, 'ভক্ত-বৎসল ভগবান যখনই কোন প্রেমিক ও ভক্ত-হৃদয়ে আত্ম-তত্ত্বের বিকাশ করিয়া ভক্তকে চরিতার্থ করেন, তখনই তিনি ভক্তের সেই হৃদয়োন্থানে প্রস্ফুটিত তত্ত্ব-কুসুমের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ সাধারণ মানবের হিতার্থে বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার প্রচার-শক্তি ভক্ত-হৃদয়ে প্রদান করিয়া থাকেন।'

"The world is not a chaos, but a cosmos. From the unity of life follows as a postulate the unity of all human efforts. It is a misreading of the laws of Nature to regard conflict as the only factor in evolution. Far more potent than competition is mutual aid and renunciation in the scheme of life."

১২৭৪ সালের আশ্বিনে, বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিবাদের ভিতর দিয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন ও সেই সঙ্গে উপাসনার ভিতর বৈষ্ণব-ধরনে কীর্ত্তন প্রথাও প্রবর্ত্তিত হয়। কীর্ত্তনের সুমধুর ঝঙ্কারে ও প্রেম-ভক্তি-রস মিশ্রিত প্রার্থনায় সেদিন কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ এক বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। প্রাচীন-পন্থী আদিসমাজীগণ, কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণকে সেদিন 'ন্যাড়ার' দলের নেতা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু নবীনের দল এক নবভাবে উন্মত্ত হইয়া, বিপক্ষ দলের নিন্দা বা উপহাস নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে বিজয়কৃষ্ণ অভিনবরূপে গড়িয়া তুলিলেন; শুষ্কতার ভিতর এক অপরূপ স্নিগ্ধতা ও সরসতা আনিয়া, সকলের প্রাণে অপার আনন্দের সৃষ্টি করিলেন।

ইহার পর আমরা কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণকে একত্র প্রচার কার্য্যে নামিতে দেখি। তাঁহাদের পশ্চিমের সেই দিগ্বিজয়ী

অভিযান কাহিনী, বাঙ্গালী বোধ হয় আজও ভুলিয়া যায় নাই। 'মুঙ্গেরের আন্দোলন' বলিয়া যে অখ্যাতিকর অধ্যায়টি এই কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট আমরা মাত্র তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। এলাহাবাদ সমাজে উপাসনা ও বক্তৃতার পর একদা সেখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মবাঙ্গালীগণের কয়েকজন কেশবচন্দ্রকে প্রকাশ্য ভাবে দেবতার মত পূজা করিয়াছিল। সৌম্যদর্শন, অব্যর্থবাক্ কেশবচন্দ্রকে দেখিলেই একটি শ্রদ্ধার ভাব জাগে। তাঁহার বাণীতে এমনই এক দিব্য আকর্ষণী শক্তি নিহিত ছিল যাহাতে লোকে সহজেই মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আগ্রহান্বিত হইত। আর এ কথা মিথ্যা নয় যে, প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা কেশবচন্দ্রের মনে যথেষ্ট ছিল ও তিনি লোকের শ্রদ্ধা পাইতে সমুৎসুক থাকিতেন। এলাহবাদে তাই 'নরদেবতা'রূপে পূজিত হইয়াও তিনি এই ভাবের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। শীঘ্রই 'অবতার'রূপে তিনি সেখানে নমস্য হইয়া উঠিলেন।

কেশবচন্দ্র নূতন-সমাজের প্রধান আচার্য্য। তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহসী হইল না। ধর্ম্মের নামে এই ব্যভিচার, সত্যের আবরণে অসত্যের পূজা,—সেদিন মাত্র বিজয়কৃষ্ণ সহিতে পারেন নাই, যেহেতু, প্রতিষ্ঠাকে তিনি আজীবন শূকরী-বিষ্ঠার মতনই ঘৃণা করিয়া চলিতেন। মুঙ্গের হইতে এলাহাবাদে আসিয়া তিনি এই অন্যায় ও অসত্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তদানীন্তন 'সোমপ্রকাশ' ও 'ডেলিনিউজ' পত্রিকায় দিকে দিকে এই সংবাদ জানাইয়া, ইহার প্রতীকারের জন্য

তিনি কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইলেন। আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রও বিজয়কৃষ্ণকে নিরস্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কোনমতে কৃতকার্য্য না হইয়া, পত্রিকা মারফত তিনিও বিজয়কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। কতক ব্যর্থকাম, নিরুৎসাহ ও কতক পরিমানে বিরক্ত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে ফিরিলেন।

এখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তিনি চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন এবং দলাদলির ভিতর আর থাকিবেন না,—এইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার প্রয়োজন তখনও শেষ হয় নাই। তাই দেখিতে পাই, একদা কেশবচন্দ্র শান্তিপুরে গোপনে আসিয়া, পুনরায় বিজয়কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। ১২৭৬ সালে এই অপ্রীতিকর আন্দোলনের উপর বিরতির শেষ যবনিকা পরে। সমাজের সমুদয় ভার বিজয়কৃষ্ণের উপর ন্যস্ত করিয়া কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড চলিয়া গেলেন।

তাহার পর বৎসরাধিক কাল ধরিয়া বাঙ্‌লা ও ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাপকতা সুদূর প্রসারিণী করিয়া তুলিলেন। সমস্ত ভারতের বুকে, ভ্রাম্যমান, সত্যধর্ম্ম প্রচাররত, বাঙ্‌লার এই ধর্ম্মগুরুকে সেদিন সত্যই দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য বলিয়া মনে হইত। ঢাকা, কুমিল্লা, মৈমনসিংহে কিছুদিন প্রচারকার্য্য করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ পাঞ্জাবের দিকে ছুটিলেন। বৃন্দাবন, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, লাহোর, অমৃতসহর ইত্যাদি বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে মুঙ্গের

হইতে বাঙলায় ফিরিলেন। পরিশেষে ১২৭৬ সালের মধ্যভাগে সপরিবারে ঢাকায় চলিয়া আসিলেন।

১২৭৭ সনের প্রথমভাগে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড-প্রত্যাগত হইয়া 'ভারত-সংস্কার সভা' স্থাপনা করেন। পূর্ব্বের মতন এবারও বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের এই নব-প্রচেষ্টার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। জাতি-গঠন করিবার বিপুল পরিকল্পনা লইয়া এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবিষ্য বংশধরগণকে শুধু ধর্ম্মে নয়, সকল দিক দিয়াই উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে, কেশবচন্দ্র সম্পূর্ণ প্রাচ্য আদর্শে, এই সভা গঠন করেন। সভার প্রথম অবস্থায় অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে বিজয়কৃষ্ণ দারুণ হৃদ্‌রোগে আক্রমিত হন। এই ব্যাধি তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ছিল। এই বৎসরের মাঘ মাসে বেলঘরিয়ার বাগানে, সভার আশ্রম বিভাগ খোলা হয়। ইহাই 'ভারত-আশ্রম' নামে সেদিন খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, এইসব পুরুষ ও স্ত্রী আলাদাভাবে এই আশ্রমে পালন করিতেন। কিছুকাল এইখানে থাকিবার পর, স্ত্রী, শ্বাশুরী ও শিশুপুত্র যোগজীবনকে এই আশ্রমে রাখিয়া, বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ উত্তর বঙ্গ ও আসামে প্রচারকার্য্যে বাহির হন।

বগুড়া, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, কাছার, শিবসাগর (আসাম), রংপুর ও কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্যের পর, ১২৭৭ সালের শেষভাগে বিজয়কৃষ্ণকে আমরা পুনরায় শান্তিপুরে দেখিতে পাই। ১২৭৮ সালে কেশবচন্দ্রকে লইয়া আবার পাঞ্জাব ও পশ্চিমের দিকে গিয়া, লক্ষ্ণৌ, দেরাদুন, বেরিলি,

সাজাহানপুর, সাহারানপুর, লাহোর, অমৃতসহর, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, ও জব্বলপুর প্রভৃতি বহু স্থানে তিন-বৎসরাধিক কাল ধরিয়া, বিপুল উৎসাহে, বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাপকভাবে প্রচারক-জীবনের ইহাই শেষ বৎসর। ইহার পর আমরা বিজয়কৃষ্ণের বিচিত্র জীবন-কাহিনীর নূতন অধ্যায় আলোচনা করিব। তাঁহার সমগ্র জীবনেতিহাসের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অধ্যায়।

শান্তিপুরে একদিন যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল,—বিজয়কৃষ্ণের অন্তর্নিহিত সেই ভক্তি, আজ প্রকাশের উদ্গত-সম্ভাবনায়, তাঁহার হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। ১২৮১ সনের শেষভাগে পাঞ্জাব হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি হৃদ্‌রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। বেদনা উঠিলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এইসময় এক দৈবঘটনায় তাঁহার চিত্তবৃত্তি প্রচণ্ডবেগে ভক্তিপথ ধরিয়া ছুটিবার অবকাশ পায়।

বিজয়কৃষ্ণ তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটি বাসায় থাকিতেন। একদা রাত্রির শেষ প্রহরে স্বপ্নে একটি সাধু দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। স্বপ্নদৃষ্ট সেই সাধুকে পরদিন প্রাতে গঙ্গাতীরে ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট স্থানেই বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সেই মহাত্মা-প্রদত্ত ভস্মে তাঁহার হৃদ্‌রোগের মূর্চ্ছাভাব কাটিয়া যায়। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহাকে রাস্তার সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা করিতে দেখা যায়। ভালমন্দ কিছুই বিচার না করিয়া,

রাস্তাঘাটে সাধুর বেশে কাহাকে দেখিলেই, ভক্তিসহকারে নমস্কার করিতে এই ব্রহ্মজ্ঞানী আর মোটেই কুণ্ঠিত হইতেন না। বিজয়কৃষ্ণকে এইরকম কুসংস্কারে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া সহকর্ম্মী অনেক ব্রাহ্ম-ভ্রাতাই উপহাস করিতেন। স্বপ্নের ভিতর দিয়া জন্মের ভোগ শেষ হইতে পারে, জীবনের দিক্ বিশেষ স্বপ্নে পরিস্কার হইয়া যায়,—এই বিশ্বাস তাঁহার এখন দৃঢ় হইল। ভাঙ্গনের দেবতা তাঁহার ভক্তকে আজ নূতন করিয়া গড়িতে স্তুরু করিলেন।

আর একদিন, মৃজাপুর ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময়, সহসা দণ্ড-কমণ্ডলুধারী কাঙ্গালবেশী এক দীর্ঘাকৃতি সাধুর মৃদুকরস্পর্শে, সমস্ত শরীর, মন, অন্তর ও বাহিরে, এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব স্নিগ্ধতা বোধ করিয়া, আমরা বিজয়কৃষ্ণকে বিস্মিত-বিমূঢ়ের ন্যায় সেই সাধুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে দেখি। ইডেন গার্ডেনের জনবিরল স্থানে সাধুর নিকট বহু উপদেশ শুনিয়া, "শিষ্যস্তেহং সাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্",—এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া বিজয়কৃষ্ণ দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য, অদ্বিতীয় প্রচারকের আজ কী বিচিত্র পরিবর্ত্তন, তাঁহার হৃদ্-গ্রন্থির কি অভাবনীয় সহজ উন্মোচন! ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিজয়কৃষ্ণের বিচ্ছিন্ন হইবার মূলে এই দুইটি ঘটনার অন্তর্নিহিত রহস্যই প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া মনে হয়।

১২৮২ সনে 'ভারত-আশ্রমে' সাধনার ক্রম-বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে, বিজয়কৃষ্ণ, সংযম ও ভক্তিসাধন-ব্রত লইয়া নির্জ্জনে সাধন করিবার জন্য, বাগআঁচড়ার জন-বিরল উদ্যানে

চলিয়া আসিলেন। যে সংসার, সমাজ কৈশোরে ত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে বাহিরে আসিয়াছিলেন, সেই সংসার, সেই সমাজ দ্বিতীয়বার ত্যাগ করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ সেই সত্যের সন্ধানে আবার নূতন করিয়া ছুটিলেন। বাগআঁচড়ায় ব্রাহ্ম-সমাজের নির্জ্জন উদ্যান, তাঁহার ধর্ম্মসাধনের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইল। কলিকাতার কোলাহল ও কর্ম্মবহুলতা হইতে বহু দূরে থাকিয়া, দিনের পর দিন গভীর ধ্যান ও চিন্তায় যাপন করিতে করিতে তাঁহার প্রখর আত্মদৃষ্টি জন্মিল। নিজের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ এইবার নিঃসংশয় ভাবে বুঝিলেন,—জীবনে ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা অতি হীন, বহিরঙ্গ মাত্র। প্রাণের মধ্যে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও আশঙ্কার ভিতর দিয়া কি একটি জিনিষের অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। মনে হইল,—এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ধর্ম্ম-চিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যানধারনাদি এবং নানা দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচার সমস্তই বৃথা হইয়াছে; অন্তরের আদিম অপূর্ণতা, অপূর্ণই রহিয়াছে। তবে ধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? স্তরে স্তরে আত্মজ্ঞানের বহিরাবরণ উন্মোচিত হইতে লাগিল; ক্রমে আরও বুঝিলেন,—ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায় নাই—তাঁহার সহিত সমস্ত প্রাণের অবিচ্ছেদ্য যোগ ভিন্ন পথ নাই। প্রাণপ্রদীপকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া, তাহার ভাস্বর, নিষ্কম্প শিখার স্থিরদ্যুতিতে, তাঁহার

চিদ্‌ঘন 'রসরাজ মহাভাব' মূর্ত্তিখানি, নয়নে নয়ন রাখিয়া, প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত অন্তরের অভাব দূর হইবে না।

তাহার পরের কথা, বিজয়কৃষ্ণের নিজ কথায় বলি—"আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর, এ সময় আমার কি করা কর্ত্তব্য, বলে দাও।" এ সময়ে পরিষ্কার-রূপে আকাশবাণী হল, শুন্‌লাম, "গণ্ডীর ভিতর থাক্‌লে, জীবনে সত্যলাভ হবে না।" আকাশবাণী শুনে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। মানুষের দিকে চেয়ে চল্‌লে, ধর্ম্মকর্ম্ম কখনও হয় না। মানুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, সেই দিকে দৃষ্টি পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ। কারও দিকে না তাকায়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, যদি নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা, না হলে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্যলাভের জন্য সকলকেই যে একই পথে একই মতে চল্‌তে হবে, তা বলা যায় না। মানুষ যেমন পৃথক্ পৃথক্, তাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চল্‌তে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে, ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।"

গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকার দোষ ক্রমে ক্রমে অনুভব করিলেন। বুঝিলেন—'জীবন-গঠনের প্রথম অবস্থায় এগুলির নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ এগুলিই তখনকার পথ। আর পথ না হইলে চলে না। কিন্তু পথ যে চিরদিনই সঙ্কীর্ণ।

যতক্ষণ গ্রামে, বাসভবনে প্রবেশ না করা যায় ততক্ষণ পথের প্রয়োজন। অমর আত্মা যখন অনন্ত পরমাত্মা সাগরে তরণীর ন্যায় অনন্ত হিল্লোলে ভাসিতে শিখিয়াছে, তখন আর কি সে ডাঙ্গায় থাকিতে পারে ? জলের তরী জলেই বাঁচিবে, জলেই মরিবে। জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহার তরীত্ব চলিয়া যায়। প্রবল ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গে, নৃত্য করিতে করিতে, যদি তাহার ক্ষুদ্র বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া সে প্রেমবারি পান করিতে করিতে অনন্ত মহাসিন্ধুর অনন্ত বিশাল বক্ষে, চিরদিনের মত লুক্কায়িত হইয়া যায়। কি সুখ, কি আনন্দ, কি আরাম।"

এই অবস্থার পর, কিরূপে দিনযামিনী ব্রহ্মসংসর্গ-স্বর্গে বাস করিয়া, সকল বন্ধন মুক্ত হইবেন ও পরমাত্মা-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, তাঁহার পরিপূর্ণ প্রেমসুধা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পান করিবেন—সেই আশায়, সেই উন্মাদনায় তাঁহার সাধনার বিরাম ছিল না—বিশ্রাম ছিল না। এই নির্জ্জন উদ্যানে, নিবিড় সাধনার ভিতর দিয়া, আত্ম-বেদের অভ্রান্ত বাণী শুনিলেন—"যদিও সামাজিক ধর্ম্ম মানুষকে সুখী করে, আনন্দ দেয়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নিরাপদ অবস্থালাভের সম্ভাবনা নাই। জীবনে এই ভগবৎ-ইচ্ছার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নিমগ্ন হইতে হইবে, আরও প্রগাঢ়রূপে 'তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ'-রূপে, তাঁহার সাধনভজনে নিযুক্ত হইয়া, দিবস-যামিনী তৎসহবাসে বাস করিতে হইবে।"

এম্‌নিভাবেই আত্মজ্ঞান-সিদ্ধ হইয়া, বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়-বীণার তারে তারে বুঝি সেদিন রণিয়া উঠিয়াছিল—

"শিকলের এ বাঁধন ভেঙ্গে দাও ভেঙ্গে দাও
পথ-ভোলা পথিকেরে নিয়ে যাও নিয়ে যাও।
পথ বলে দাও মোরে জীবনের ধ্রুবতারা,
হেথাকার যত কাজ হ'য়ে গেছে সব সারা।"

ইহার পরের অবস্থা অবর্ণনীয়। তিনি আকুল হইয়া, নিশীথে সেই নির্জ্জন উদ্যান কাঁপাইয়া ডাকিয়া উঠিতেন—

'হে দেব হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো।
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ, হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদংদৃশোর্ম্মে॥'

অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল, কুৎসিৎ ক্রূর, তা'র পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্র বেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ, কোমল।

এই অবস্থায় যখন বিজয়কৃষ্ণের দিন যাইতেছিল, তখন একদিন মধ্যাহ্নে যোগমায়া একখানি পত্র-হস্তে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন,—'নগেন ঠাকুর-পো চিঠি দিয়াছেন। লিখিতেছেন,—কেশব বাবুর মেয়ের বিবাহের আন্দোলনে যেন তুমি যোগ না দাও। তাহা হইলে আমাদের ছেলেমেয়ে লইয়া অসুবিধায় পড়িতে হইবে।' স্বাধ্বী যোগমায়া তখন বাগআঁচ্ড়ায় ছিলেন। স্বামীর সহিত নির্জ্জন ধ্যানধারণার ভিতর দিয়া ভারতের ভাবী তপস্বিনী তখন আপনার জীবনখানি স্বামীর অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বাগআঁচ্ড়ায় চলিয়া যাইবার পর কেশবচন্দ্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের দলের পুষ্টিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে কুচবিহারের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক মহারাজ-কুমারের সহিত তাঁহার অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বালকবালিকার বিবাহের একটি বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজপরিবারের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধনে যুক্ত

হইবার আকাঙ্ক্ষাই কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সংঘর্ষের মূল। কেশবচন্দ্রের দেবোপম বিশুদ্ধ চরিত্রে ইহাই একমাত্র ত্রুটী এবং ইহাতেই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন, কলঙ্কের ঘন-মসী-ছায়ায় অবলুপ্ত হইয়া যায়। বাঙ্গালীর বুকভরা আদর্শের ধন কেশবচন্দ্রের ভাগ্যে ইহাই ছিল বিধাতার নির্দ্দিষ্ট নিয়তির অতি করুণ পরিহাস। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহাই 'কুচ-বিহার আন্দোলন' নামে অখ্যাত অধ্যায়। বিজয়কৃষ্ণ এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা হইয়া কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন।

পত্নীর মুখে, নগেন্দ্রনাথের পত্রখানি শুনিয়া, আজন্ম-সত্যানুরাগী বিজয়কৃষ্ণের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তেজ-পূর্ণ বাক্যে বলিলেন—"কেশব বাবু কি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, না পালনকর্ত্তা? আমি কি তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? সত্যের অবমাননা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না।" সত্যকথা বলিতে গেলে সেই সময় তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গের ভরণপোষণ কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত অর্থে নির্ব্বাহিত হইত। কেশবচন্দ্রের নিকট বিজয়কৃষ্ণ কতখানি ঋণী, তাহা বিজয়কৃষ্ণই জানিতেন। তথাপি উদারহৃদয়, মহৎপ্রাণ এই বন্ধুর বিরুদ্ধে সত্যের খাতিরে দাঁড়াইতে তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না।

আন্দোলনের অন্যতম নেতা হইয়া,—বিজয়কৃষ্ণ নির্জ্জনের সাধনা ফেলিয়া শীঘ্রই কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। যশমান লাভের আশায় নয়, নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে

লোকসমাজ মুগ্ধ করিবার জন্য নয়,—মাত্র সত্যকে অসত্যের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই তিনি আজ ব্যাকুল হইলেন। স্ত্রী যেমন তাহার স্বামীকে ভালবাসে, শিশু যেমন তাহার মাতাকে ভালবাসে, ভক্ত যেমন তাহার ভগবানকে ভালবাসে,—সত্যব্রত বিজয়কৃষ্ণও তেমনি এই সত্যকে ভালবাসিতেন। মাতৃহৃদয়ের মমতা ও পত্নীহৃদয়ের আশঙ্কা লইয়া তিনি সমস্ত রকম অন্যায়, অসত্য হইতে, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই সত্যকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। সত্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, মাত্র তাঁহারই লোকোত্তর জীবনী ও সাধনার ভিতর দিয়া নূতন করিয়া, বাঙ্গালী এই প্রথম দেখিতে পাইল।

যদিও এ আন্দোলন পরিণামে ব্যর্থ হইয়াছিল, তথাপি ইহাকে সার্থক করিবার জন্য, বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের সমগ্র শক্তি ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রের একাংশের বিরাট-রূপ দেখিতে পাই। আন্দোলনকারীদের অন্যতম হইয়া, সত্যবুদ্ধিতে প্রতিবাদ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়কৃষ্ণ জাতিকে সেদিন এক অভিনব বাণী শুনাইলেন—"হিন্দুসমাজে অতি আদরে ও সম্ভ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম। কিন্তু সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়কে যতই সত্যের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই আমি হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, ব্রাহ্মসমাজে সকল অভাব দূর হইবে; ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন, সেখানে অশান্তি ও অসত্য নাই। বাস্তবিকও ব্রাহ্মসমাজকে প্রথমে শান্তিনিকেতনই দেখিয়াছিলাম। তখন

ব্রহ্মনাম শুনিলেই আনন্দ হইত। এখন বোধ হয় সে সকল স্বপ্ন, মনে হয় দয়াময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ছবি, একবার প্রকাশ করিয়া, আমাদের দোষে তাহা কাড়িয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ বলিলে পূর্ব্বের আদর্শের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

"মনে হয় ব্রাহ্মসমাজ যাহা হয় হউক, আর কোন প্রকার আন্দোলন করিব না। কিন্তু সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, এবং স্বদেশের দুরাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আর স্থির থাকিতে পারি না। অন্যায় অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ। সুতরাং উদাসীন থাকিতে পারি না। যখন যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতিপালন করিব। তাহার জন্য চিরদিন অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাহার অনুসরণকে কপটতা মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করি।" বুঝি বিজয়কৃষ্ণের এই সত্যাশ্রয়ী সাধনা বহুদিন পরে বিশ্বকবির ছন্দে বাণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইঙ্গিতে বাঙ্গালীকে শুনাইল—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

নানাপ্রকার ও দীর্ঘকালস্থায়ী বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়া এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে একধাপ নীচে নামাইয়া দিলেন। দুই দলই পরস্পরের কার্য্যের সুতীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের আবর্ত্ত মথিয়া বাঙ্গলায় সেদিন যে বিষ

উঠিয়াছিল, তাহা বিজয়কৃষ্ণ একাকী পান করিলেন, নতুবা বুঝি সত্যের আদর্শ ম্লান হইয়া যায়। অবশেষে দুই দল পৃথক হওয়ায় আন্দোলন প্রশমিত হইল।

১২৮৫ সাল। এই বৎসরের প্রারম্ভেই বাঙ্গলার মাটিতে তৃতীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভায় বিজয়কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সকলের সম্মতি অনুসারে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশক্রমে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল। পশ্চিমদেশীয়া বিদুষী মহিলা মিস কলেট্ সেদিন প্রকাশ্য সভায় বিজয়কৃষ্ণের কার্য্যের সমর্থন করিয়া, নবজাত সমাজের উপর যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ এখন এই নবগঠিত সমাজের প্রধান আচার্য্য ও প্রচারক—দুইই হইলেন। শিবনাথ, নগেন্দ্র ও অঘোরনাথ এই দলেই রহিয়া গেলেন। এই বিষয়ে তখনকার 'তত্ত্ব-কৌমুদী' হইতে একটু বিবরণ দিতেছি—"তাঁহার (বিজয়কৃষ্ণের) তৃষিত ব্যাকুল-আত্মা, তাঁহার ভক্তি-বিনয় মিশ্রিত মধুর চরিত্র, ও তাঁহার দেব-দুর্ল্লভ উন্নত জীবন, সকলেরই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ও সহায় হইয়া উঠিল। তাঁহার বাসভবন, নিত্য শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, সৎপ্রসঙ্গ, সাধুসমাগম ও কীর্ত্তন-আনন্দে প্রকৃত আশ্রমরূপে পরিণত হইয়া উঠিল।"

ইহারপর ঢাকা কেন্দ্র করিয়া পুনরায় বিজয়কৃষ্ণকে আমরা ১২৮৫ হইতে ১২৮৭ সনের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রচারক-কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই। পূর্ব্বের মতনই উৎসাহপূর্ণ জীবন

লইয়া, তিনি বাঙ্গলার স্থানে স্থানে, উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতা ও সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১২৮৭ সালের মধ্য-ভাগে ঢাকার পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ হইতে অবসর লইয়া বিশেষভাবে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রচারার্থ যাত্রা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শিব-নারায়ণ অগ্নিহোত্রী, এই অভিযানে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। সমগ্র দেশের নরনারীর নিকট মুক্তির সমাচার প্রচার করিবার জন্য, ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যিনি সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে স্থান বিশেষে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব।

এই বৎসর কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে 'নববিধান' বলিয়া ঘোষণা করেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন কলিকাতায়। সত্যের সাধক, সত্যের নিষ্কপট পূজারীর আবার টনক নড়িল। তিনি কেশবচন্দ্রের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়া, প্রকাশ্যে উহার প্রতিবাদ করিলেন। 'নববিধান' কেশবচন্দ্রের এক কল্পিত আদর্শ, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-আদর্শের সহিত উহার সামঞ্জস্য ছিল না। তাই বিজয়-কৃষ্ণ দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"ঈশ্বরের আদেশেই সত্য প্রচার করিতে হইবে, কিন্তু লোকের মুখ চাহিয়া নয়।" এইরূপ মহৎভাব তাঁহার পরিচালক না হইলে, তিনি কখনও প্রতিবাদক্ষেত্রে সদ্ভাব ও সমতা রক্ষা করিতে পারিতেন না। কেশবচন্দ্র তাঁহার শত্রু নহেন, বাংলারও শত্রু নহেন। তাঁহার প্রতি বিজয়কৃষ্ণের অপরিসীম শ্রদ্ধা, অগাধ বিশ্বাস ও অসামান্য বন্ধুত্ব-প্রীতি, কেশবচন্দ্রের মৃত্যুপর্য্যন্ত একভাবেই

ছিল। বাহিরে কার্য্যক্ষেত্রে যদিও তাঁহারা দুইজন পরস্পর হইতে আলাদা ছিলেন, অন্তরে তাঁহাদের মিলন-রাখী চিরদিন অবিচ্ছেদ্য ছিল।

ইহার পর ১২৮৮ ও ১২৮৯ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তিনি হাজারীবাগ, গয়া, বাঁকীপুর, মজঃফরপুর, মতিহারী, গাজীপুর, জামালপুর, বোয়ালিয়া, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রামপুরহাট ইত্যাদি বহুস্থানে উৎসবে যোগদান, বক্তৃতা ও উপাসনা করেন। ব্রাহ্মসমাজে, প্রকাশ্যভাবে বিজয়কৃষ্ণের, ইহাই শেষ প্রচারক-জীবন। ভগবানের প্রয়োজন শেষ হইল, বিজয়কৃষ্ণের জীবনেতিহাসের সর্ব্বোত্তম ও তাঁহার সাধকজীবনের নিগূঢ় তথ্যপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হইল।

বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া একটি অপবাদ আছে ; কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্মকথা, তাঁহার কথাতেই বলি—"শাস্ত্র ও সদাচার ধরিয়া থাকিলে ঠকিতে হয় না। পুরাতন লইয়া বসিয়া থাকিলে লাভ আছে। শুষ্ক মতের উপর মানুষ কত দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে ? আমি যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিলাম নিজের বুদ্ধিতে নয়। একদিন সীতানাথ মহাপ্রভুকে লইয়া গেলেন ; গিয়া বলিলেন,—'ওরে ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ হইয়াছে, এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হ'।' এখন দেখিতেছি নির্ভরই একমাত্র শান্তি।"

ইহাই আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত। ইহাই সাধনার প্রথম ও শেষ কথা। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন—এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। কৈশোরের যে কামনা

লইয়া সমাজ, সংসার, সংস্কার, শাস্ত্র, বিগ্রহ সবকিছু তিনি তুচ্ছ করিয়াছিলেন, যৌবনে যাহা দীপ্ত ও প্রচণ্ড হইয়া আত্মানুসন্ধানের ভিতর দিয়া 'ভূমৈব সুখম্'—এই তথ্য তাঁহার অন্তরে জাগাইয়া তুলিয়াছিল,—সেই সত্যানুরাগ, সত্যানুসন্ধিৎসা, সত্যপ্রীতি, সত্যপ্রেম ও সত্যভক্তি আজ বিজয়কৃষ্ণকে প্রবল ভাবে, গণ্ডির বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিল। ইহাই ভগবৎকৃপা। "যাহা সত্য—তাহাই জানিতে হইবে"—কৃপাসিদ্ধ, সত্যসিদ্ধ, বাংলার ভাবী ভক্তবীরের আত্মাভিসারী এই কথাই—তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িবার একমাত্র ভিতরের কথা।

"শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিনী ঝুরে অনুরাগে॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়॥
ঐরূপে আছে কি মাধুরী।
মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি॥

পরিণতি

"The voice of the Divine Teacher can be heard crying to us, "abandon that you may possess; do my will and know yourselves, purify yourselves, cease to follow your fancies. He that has ears, let him hear. Knowledge will not come without self-communion, without light from within, not even the knowledge of the practical steps that can lead to success. Every step that is taken in the light of a wisdom will fail until the truth is driven home."

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
হইলে তাহার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কভু না জীয়য় ॥

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের তৃষিত-আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। এ ব্যাকুলতা কখন রাধাভাবে, কখনও চণ্ডীদাসের ভিতর দিয়া, কখনও বা গৌরাঙ্গের ভিতর দিয়া আপনা আপনি প্রকাশ পাইয়াছে। আজ তাহা, নূতন করিয়া বিজয়কৃষ্ণের ভিতর দিয়া, আমাদের সম্মুখে নবরূপে, নবভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালীর জন্য—সমগ্র জাতির জন্য, বিজয়কৃষ্ণের যে সাধনা, তাহাই এইবার আলোচনা করিব।

বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবনে, মানুষের মনে এমনই একটি অবস্থার উদয় হয়, যখন প্রাণ ভগবানের জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া পড়ে, তাঁহাকে ভাল করিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত, কিছুতেই শান্ত হয় না। পিপাসিত ব্যক্তি যেমন আর্ত্তি লইয়া জলের অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়ায়, এই অবস্থায় ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিও, সকল স্থানে প্রাণ-দেবতাকে খুঁজিয়া ফিরে।

বাগআঁচড়ার, নির্জ্জন উদ্যানে, একাগ্র আত্ম-চিন্তার ফলে, বিজয়কৃষ্ণের ভিতর আমরা বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। এখন তাঁহার লক্ষ্য—কেমন করিয়া স্থায়ীভাবে সেই প্রিয়তমের সঙ্গ করিবেন। কেবলই মনে হইতে লাগিল—‘নিরাপদ ভূমি না

পাইলে, আমার ত কিছুই পাওয়া হইল না'—এই চিন্তায় সমাজ-প্রিয়তা, বন্ধুজন-প্রিয়তা, স্বজন-প্রিয়তা—সকলই তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল। "কাঁহা করো কাঁহা যাঙ. কোথা গেলে কৃষ্ণ পাঙ"—এই ভাবে তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আমি হিন্দু সমাজও চাই না, ব্রাহ্মসমাজও চাই না, খৃষ্টান সমাজও চাই না; আমি কোন দলাদলি চাই না। কেবল সেই প্রাণের দেবতাকে চাই; তাঁহাকে ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে চাই।" বুঝি তাঁহাকে সবিশেষ ভাবে পাইবার জন্য এমনি ব্যাকুলতা জন্মিলে—"লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়।" তাই দেখিতে পাই, এই আকাঙ্ক্ষাই বিজয়-কৃষ্ণকে লোক-নিন্দা ও লোক-প্রশংসা হইতে নির্ম্মুক্ত করিল। কী দিব্য ইঙ্গিত পাইয়া, তাঁহার অন্তর মথিয়া বিরহের সেই চিরন্তনী বাণী ধ্বনিয়া উঠিল—

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো,
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥"

ইহাই পূর্ব্বরাগ। দূর অতীতে একদিন সুখময় বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে বিরহিনী রাধিকা, শ্যামের বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ললিতা বিশাখার গলা জড়াইয়া বলিতেন—

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

নাজানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥"

সেই বলা আজও শেষ হয় নাই—সেই কান্না আজও ফুরায় নাই—পাইবার জন্য সেই চাওয়া আজও নিঃশেষ হয় নাই। সকলের জীবনে এ সৌভাগ্য হয় না, যাঁহাদের হয়, তাঁহাদের দেখিয়া, তাঁহাদের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াও পুণ্য আছে।

বিজয়কৃষ্ণের উপর জাতির তাই এত মমতা, এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তি। কারণ, মাত্র তাঁহার ভিতর দিয়াই বাঙ্গালী শেষবার এই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের আর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। জীবনব্যাপী সাধনার ভিতর দিয়া বিজয়কৃষ্ণ ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ ও চরম ফল যাহা পাইয়াছিলেন, উত্তরাধিকারী সূত্রে, সমগ্র জাতি আজ তাহার অধিকারী, যেহেতু, ভবিষ্য-ভারত গঠন করিবার পক্ষে ইহাই আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। তাই আমরা তাঁহার সাধনার মর্ম্মকথা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে চাই ও জানিতে চাই—কি সত্যবস্তু তাঁহার ভিতরে তিনি লুকাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যাহার সন্ধান আজও আমরা পাই নাই।

বিজয়কৃষ্ণের ভিতর ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভের বিদেহী-তৃষ্ণা দিনের পর দিন বাড়িতে লাগিল। প্রাণের এই দুর্নিবারী জ্বালা, বুঝি জগতের কোনও জিনিষে জুড়াইতে চাহে না। জগতের বলি কেন? স্বর্গেও বোধ করি এমন জিনিষ নাই,

যাহা ভগবানের ভক্তের এই আকুলতা শান্ত করিতে পারে। সম্মুখে—জগৎ ও সংসারের মনোমুগ্ধ কর দৃশ্য মুছিয়া, দূর দিক্-চক্রবালে অস্পষ্টভাবে ইন্দ্রধনুর কি এক সম্মোহনচ্ছটা উদ্ভাসিয়া উঠে; জগতের নানা তানলয় সুরভরা ধ্বনি, ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া, দূর পথ হইতে, ধ্রুব, গাঢ় অথচ অশ্রুত এক প্রাণ-মন-কাড়া আহ্বান, কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে আঘাত করিয়া, সুপ্ত পুরুষকে সচেতন ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। ইচ্ছা হয়—নিশিদিন ঐ আহ্বান উৎকর্ণ হইয়া শুনি—ঐ রূপসাগরে ডুবিয়া যাই, কিন্তু পারি কৈ? এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বা অশ্রুত-পূর্ব্ব, রূপ ও ধ্বনির স্থিতি হয় না কেন? তবে কি ইহা কল্পনা মাত্র? না, অলীক চিন্তার চিত্ত-বিভ্রমকারী ছায়া ছবি? যদি রূপ সত্য হয়, বাণী স্থির ও ধ্রুব হয় তবে আমার হৃদয়ে তাহা চির-দিনের মত, অনুক্ষণের জন্য প্রতিফলিত ও প্রতিশব্দিত হইবে। আমার এই মানুষী দেহের ভিতরই তাঁহার বাসক-শয়ন পাতিব, আমার এই সংসারের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই, তাঁহাকে আসিতে হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ এখন এই ভাবে বিভোর—তন্ময়। তখনকার অবস্থা তিনি নিজে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতিমত উপাসনা ক'রে নানাপ্রকার অবস্থা আমার ভিতরে প্রকাশ হোতে লাগ্‌ল। অপ্রাকৃত দর্শন-শ্রবণাদিও সবই হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হ'তো না। হয় আর যায়—এম্‌নি অবস্থা। সত্যবস্তু প্রকাশ হ'লে তাহা আবার যায় কেন—এই সংশয় আমার উপস্থিত হ'লো।"

এই সংশয়ের ভিতর দিয়া যে সত্যবস্তু লাভ হয়, তাহাই অবিচ্ছেদ্যভাবে জীবনে জীবনে—শতজন্মে থাকিয়া যায়। "সংশয়ও হয় আবার বিশ্বাসও হয়; সবই তাঁর ইচ্ছায়। মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই, তাঁর কৃপাই সার"—এই দিব্য অনুভূতি, দৈবী-প্রেরণায় বুঝিতে পারিয়া বিজয়কৃষ্ণ গৃহত্যাগে আজ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মায়ার আবরন দূরে সরিয়া গেল। নিজহস্তে ভগবান তখন তাঁহার যাইবার পথখানি সকলবাধা ও বিঘ্ন হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে আয়োজন করিতে লাগিলেন। কারণ—বিশ্বাসী, নির্ভরশীল ও একান্ত ব্যাকুল ভক্তের জন্য তিনি এই কাজটুকু করিতে স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়াই, জগতের গত, আগত ও অনাগত ভক্ত-গণের আশ্বাসের জন্য সেই অমর বাণী—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে—"

ব্রহ্মবিদ্যার ভিতর দিয়া শুনাইয়াছেন। সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই একই কথা আমাদের বলিয়া গিয়াছেন—

"সাধু শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান ॥"

ঠিক এই সময়, কলিকাতায় এক সাধুকে দেখিয়া, বিজয়-কৃষ্ণকে তাঁহার মনের তৎকালীনভাব, তাঁহার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিতে দেখি। "একদিন মেছোবাজার ষ্ট্রীটে একটি

মহাপুরুষের দর্শন পাই। তাঁকে আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বলায় তিনি বল্‌লেন, "অনেক অবস্থাই প্রকাশ হ'তে পারে; তাতে কি হোলো? থাকে না তো। যথাশাস্ত্র গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিলে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হবে না।"

তাহার পর যাহা এতদিন বিজয়কৃষ্ণের নিকট বোঝা ও না-বোঝার মধ্যে ছিল, এই মহাপুরুষের আর একটি কথায় তাঁহার অবস্থার যথার্থ্যতা বুঝিতে পারিলেন। আত্মদ্রষ্টা সেই মহাপুরুষ বুঝি ভগবৎপ্রেরিত কোন দেবদূতই হইবেন, তাই তিনি যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন—"ঘরখানা তো বেশ প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আল্‌গা খুঁটীর উপরে, ভিত্তিশূন্য, দাঁড়াবে কি প্রকারে? গুরু নাই; এ কখন টিক্‌বে না।" ব্রহ্মজ্ঞানীর বিপুল সংস্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। বুঝিলেন —গুরু চাই। কিন্তু নিঃসংশয়রূপে এখনও তিনি গুরু-বাদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

বিজয়কৃষ্ণের গুরু-অন্বেষণ—সে এক অশ্রুত-পূর্ব্ব ইতিহাস। ভারতের ধর্ম্মজগতে, প্রাণের এমন আকুলতা লইয়া সমগ্র ভারতের পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গল প্রভৃতি দুর্লজ্ঘ্য ও দুরাতিক্রম্য স্থানে একাকী পরিভ্রমণ—তাহা একান্ত বিরল। দার্জ্জিলিঙ্গের বনপ্রান্ত হইতে নর্ম্মদার তীর পর্য্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ পরিভ্রমণ করিয়াছেন—কখনও বা বিন্ধ্যাচলে, তিব্বতে, হিমালয়ে ছুটিয়াছেন; কখনও আবার বেদবাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা অধ্যয়ন করিয়াছেন—কখনও, রামাৎ শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান, ফকির, বৌদ্ধযোগী, অঘোরপন্থী, প্রভৃতি বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের সাধুর নিকট গিয়াছেন—প্রাণের পিপাসা কোথাও দূর হয় নাই।

তাঁহার নিজের কথায় এই কাহিনী শুনিতে মিষ্ট লাগে—"সত্যবস্তুর অনুসন্ধানে বাহির হ'লাম। অনেক ঘুর্‌লাম। কোথায় কি আছে প্রত্যক্ষ কর্‌তে, কবিরপন্থী, গোরখ্‌পন্থী, সুন্দরপন্থী, বাউল, দরবেশাদি—সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবেশ কর্‌লাম। একটি একটি ক'রে তাঁদের প্রণালীমত সাধন ক'রে কোন সম্প্রদায়ের কতদূর কি আছে দেখে নিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হলো না। আমি যাহা চাই, তাহা কোথাও পেলাম না। কোথাও গুরু পেলাম না। সকল মহাপুরুষ একই কথা বল্‌লেন; "গুরু তোমার ঠিক আছে; সময়ে পাবে।"

"গুরু নির্দ্দিষ্ট র'য়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃ পুনঃ মহাত্মাদের মুখে শুনে আমি গুরুর অনুসন্ধানে অস্থির হয়ে পাগলের মত ছুটাছুটি কর্‌তে লাগ্‌লাম। সেই সময়ে, আমি হিমালয়ে উঠে, বহু দুর্গমস্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে ঘুর্‌তে লাগিলাম। কয়েকটি বৌদ্ধযোগীর মুখে শুনিতে পেলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটি গোফার সন্নিকটে, এই পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে, একটি বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন।" বিজয়কৃষ্ণ, একাকী, অরণ্যের ভিতর দিয়া, অজ্ঞাতপথে, কিছুদিন গমন করিয়া সেই মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন।

এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা লাভ না করিলেও, ভারতীয়

সাধনার অব্যক্ত তত্ত্ব কিছু জানিয়া, বিজয়কৃষ্ণ পরিতৃপ্ত হইলেন। এইখানেই প্রথম শুনিলেন—"যিনি যুক্তযোগী অর্থাৎ সর্ব্বদাই পরব্রহ্মে সংযুক্ত থাকেন তিনিই নির্ভয়; যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা ব্রহ্মের জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাতে সর্ব্বদা সংযুক্ত, তিনিই যুক্তযোগী, তিনিই জীবন্মুক্ত। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার দাস হয়; তিনিই মুক্ত, তিনিই স্বাধীন।"

তাহারপর বিনা বেশভূষা ও আহারে সন্ন্যাসীর শরীরে দিব্যজ্যোতি প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলে, মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন—"কাচের লণ্ঠনে দীপ জ্বালিয়া রাখিলে, লণ্ঠনের কাচ ভেদ করিয়া সেই আলোকের জ্যোতি বাহির হইয়া থাকে। তদ্রুপ মনুষ্যের শরীরটি কাচের লণ্ঠন; ইহার মধ্যে যে 'আমি' নামে জীবাত্মা তাহাই বাতি অথবা দীপ-শলিতা; পূর্ণজ্ঞানময় পরব্রহ্ম অগ্নি। সেই ব্রহ্মাগ্নি জীবাত্মা-বাতিতে জ্বলিলে লণ্ঠনের কাচের বাহিরেও সেই আলোকের জ্যোতি দেখা যায়। এ জ্যোতি আহারে নাই, চন্দ্রসূর্য্যে নাই, পৃথিবীর অগ্নিতে নাই, আকাশের বিদ্যুতেও নাই; অথচ ব্রহ্ম চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, ও অগ্নি প্রভৃতি সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন।" পরিশেষে আত্মদর্শী সেই মহাপুরুষ বিজয়-কৃষ্ণকে বলিলেন—"যোগতত্ত্ব অতি পবিত্র। তীব্র বৈরাগ্য, উজ্জ্বল বিবিক, চিত্তের দীনতা, হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্রতা—এই সকল ভাব মনুষ্যের আত্মায় উপস্থিত হইলে, যোগতত্ত্ব শ্রবণে ও সাধনে অধিকার হয়। তোমাকে অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে। ভবিষ্যতে উপদেশ পাইবে।"

পূর্ব্বে গুরু-বাদ স্বীকার করিলেও, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় হইবার জন্যই অজ্ঞাতে সহসা বিজয়কৃষ্ণের মুখ হইতে দুইটি প্রশ্ন উঠিল—"গুরু লাভ না করিলে কি ধর্ম্ম লাভ করা যায় না ; নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম্ম হয় না ?"

প্রত্যুত্তরে মহাপুরুষ বলিলেন—"না ; গুরু না পাইলে ধর্ম্ম-লাভ হয় না। ক, খ, শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন, কৃষি বা বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; কেবল ধর্ম্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই ? ইহার পর আশ্চর্য্যের কথা আর নাই।

"যদি বল ধর্ম্ম আমার মধ্যেই আছে, তাহা আবার কাহার নিকট শিক্ষা করিব ? তবে ক, খ, প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় ত পড়িয়া আছে শিখিলেই হয়, তজ্জন্য অন্যের খোসামদ করা হয় কেন ? বন জঙ্গলে, পাহাড়ে, খনিতে রোগের ঔষধ আছে তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিষ্য হও কেন ? যাহার জল পিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোদাল খন্তা লইয়া কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না ; যেখানে জলাশয় আছে, সেখানে জলপাত্র লইয়া জল গ্রহণ করে। তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান স্বয়ং গুরু শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সে স্থান হইতে সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। যেখানে প্রেম-ভক্তি বিশ্বাস-পবিত্রতারূপ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সে স্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

"ধর্ম্ম একটি প্রণালী নহে, মত নহে, দল অথবা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্ম। সেই পরাশক্তি ভগবতী বিশ্বজননী স্বয়ং ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে—শক্তি। ধর্ম্ম মত নহে কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জানাইয়া দেন—তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। সকলের পদানত হইয়া, পদধূলি লইতে লইতে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া হৃদয় বিনীত হয়। হৃদয় এইরূপ বিনীত না হইলে গুরুদর্শন হয় না।"

তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সেই মহাপুরুষ বলিলেন,— "নিজে ঈশ্বরে নাম লইলে ধর্ম্ম হবে না কেন? পুষ্করিণী, কাটিয়া জল পান করার মত। পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জল পান না করিয়া, পুষ্করিণী খনন করিয়া জলপান করিলে যেরূপ সুবুদ্ধির কার্য্য হয় তদ্রূপ। বিশেষতঃ, ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে—স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শমাত্র যদি প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটী অক্ষর।"

আজ বিজয়কৃষ্ণের শেষ সংশয় অপনোদন হইল। গুরু প্রয়োজন, একান্ত প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞানী, আজন্ম সংস্কার-অবিরোধী বিজয়কৃষ্ণের মনের এখনকার এই বিচিত্র ভাবের মূলে—এই পরম তথ্য, মহাপুরুষের নিকট হইতে শ্রুত, এই অব্যক্ত তত্ত্ব নিহিত ছিল। তাঁহার গুরু-বাদ স্বীকারের ইহাই মর্ম্মকথা।

তাই বুঝি পরিণত জীবনে বিজয়কৃষ্ণকে আমরা বলিতে শুনি—"ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হলেও, কেউ তাঁকে ধর্‌তে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎশক্তির প্রকাশ দেখে, তথায়ই পূজা কর্‌তে হয়। গুরু তো আর মানুষ নন। গুরুই ভগবান, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা। আমি এ কথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি যে, গুরু-ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও লাভ হইতে পারে না।" তাই ভারতীয় দর্শন ঘোষণা করে—"মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং, ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ।"

শূন্যে নবীন সূর্য্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্ব চেতন কেতন আগে
জ্বল্‌ছে নূতন দীপ্তি রতন তিমির মথন শুভ্র রাগে ;
মশাল ভস্ম লুপ্তি ধূলায় নিত্য দিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দ-লোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময় ;
জয় ভুলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষা গ্রহণের ভিতর একটু তাৎপর্য্য আছে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বহু মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াও তিনি গুরুরূপে কাহাকেও বরণ করিলেন না কেন? রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, ইঁহাকে সসম্ভ্রমের সহিত দীক্ষাদানে ইতস্ততঃ করিয়াছেন ; অন্যপক্ষে, বিজয়কৃষ্ণেরও অন্তর যেন কাহার ইসারায় সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষায় আছে। ইহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারি যে, তাঁহার ভিতর দিয়া বাঙ্‌লার তথা ভারতের একটি ভবিষ্য- ধর্ম্মযুগ অভিনব ছাঁচে পরিকল্পিত হইয়া, অভিনব তত্ত্বের সহিত প্রকাশ পাইবে। বাঙ্গালীর মধ্যে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সম্বলিত এক বিচিত্র ধর্ম্ম-ভাবের অগ্রদূত হইয়া, বিজয়কৃষ্ণ একটি বিরাট ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

এখন বিজয়কৃষ্ণের অহোরাত্র চিন্তা হইল,—কোথায় সেই গুরু—কেমন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। কারণ, তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে তিনি এখন সুনিশ্চিত ভাবে

বুঝিয়াছেন যে, "বাহিরের ধর্ম্মলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎ ভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে, পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব, পঞ্চম বৎসরের শিশু, বনে বনে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া কাঁদিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না। ঈশা, জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্টের নিকট দীক্ষিত; চৈতন্য, ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষিত; গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন হয় না। ভগবান সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্যজগতে কোন কার্য্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগৎ নিয়ম ভিন্ন চলে না। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম।"

যতই এই চিন্তা একাগ্র মনে করিতে লাগিলেন ততই, তিনি আরও স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন যে গুরু ত চাই, কারণ "গুরু ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না"; কিন্তু সে কিরকম গুরু হওয়া চাই? এই প্রশ্নের উত্তরে, বিজয়কৃষ্ণ অন্তরে অনুভব করিলেন যে 'রামা শ্যামা ধামার' মত হইলে চলিবে না,—"বেদবেত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মেতে শান্তি লাভ করিয়াছেন—এইরূপ গুরুকে অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি ব্রাহ্মণ, বাসনাহীন, সমস্ত রিপু যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার সমস্ত শরীর নির্ম্মল, অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে গরিষ্ঠা ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন—এমন গুরুকে আশ্রয় করিব।"

এইরূপে ভক্তবীর এক একটি সংশয় বিশ্লেষণ করিয়া, এক একটি সত্যে উপনীত হইতে লাগিলেন। ভগবান হইতে

ভক্তের দূরত্ব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এইবার বুঝি বিজয়কৃষ্ণ ভারতীয় সাধনার রহস্যের অন্তঃপুরে অভিসার করিবেন। অতঃপর, ব্রাহ্ম-বিজয়কৃষ্ণকে আর দেখিতে পাইব না। তাঁহার জীবন-নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক মহাসমারোহে অভিনীত হইবার পর তাহার উপর যবনিকা পড়িল। অন্তরালে তাঁহার নবজীবন স্বুরু হইল। নেপথ্যের সেই কথা এইবার বলিব।

১২৯০ সাল। আষাঢ় মাস। সমস্ত নীল আকাশ ছাইয়া বর্ষা বিপুল অভিসারে তাহার মেঘময় বেণী এলাইয়াছে। শ্যামসমারোহে ধরণীর হৃদয় উপকূল রসে ভরিয়া উঠিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে, এমনই বর্ষার দুর্য্যোগে বাঙ্লার এক নিভৃত, শান্ত পল্লীর বুকে, যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল,—সেই আজ মহাকাল সাগরের বিয়াল্লিশটি তরঙ্গ পার হইয়া, গয়াধামের ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের সন্নিকটবর্ত্তি আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে, এক মহাপুরুষের শান্তিময় কোলে দ্বিতীয়বার নবজন্ম অর্থাৎ দেবজন্ম লাভ করিল।

অলৌকিক এই দীক্ষার কথা বিজয়কৃষ্ণের নিজমুখ হইতে আমরা এইভাবে শুনিতে পাই—"অবশেষে গয়াতে আকাশ-গঙ্গার পাহাড়ে রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে গিয়ে কিছুকাল রইলাম। একদিন ঐ পাহাড়ের উপরে নিরিবিলি একটি স্থানে একাকী বসে আছি, গুরু লাভ হ'লো না ভেবে, নৈরাশ্যে মনকষ্টে মূর্চ্ছা হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হলে পরে, দেখি, একটি মহাপুরুষের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। তিনি খুব স্নেহের সহিত আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আমি অম্নি

উঠে তাঁর চরণে প'ড়ে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আপনি কে? কখন এখানে এসেছেন?' তিনি বললেন 'আমি পরম-হংস মানস-সরোবরে থাকি। তোমার এই ক্লেশের অবস্থা দেখে তোমাকে দীক্ষা দিতে এইমাত্র এখানে এসেছি।' আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'এইমাত্র কি প্রকারে আপনি মানস-সরোবর হ'তে এলেন্?' পরমহংস বললেন—'যোগীরা তা পারেন। যোগীরা দেহের পঞ্চভূতকে পঞ্চভূতে মিলায়ে দিয়ে, চৈতন্য-মাত্র অবলম্বন ক'রে যথা ইচ্ছা তথা যেতে পারেন, পরে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা সেই পঞ্চভূতকে আকর্ষণ ক'রে আবার স্থূল দেহ ধারণ করেন। যোগীদের এসব ক্ষমতা আছে। আমার এই যে স্থূলদেহ দেখ্‌ছ, ইহাও ঐরূপ।'

"এই প্রকার অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা গ্রহণমাত্রই আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হলো। চৈতন্য হলে পর, চারিদিক চেয়ে দেখি পরমহংস নাই। আমার ভয়ানক নেশা হয়েছিল। ভাল করে চোখ মেলতে পারলাম না। ঢুলু ঢুলু অবস্থায়, কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম। গোফার ধারে, বেল গাছের নীচে বড় পাথরের চটাং-খানার উপর শুয়ে পড়লাম। এগার দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল।"

এই মহাপুরুষই মানস-সরোবরের সন্নিকটবর্ত্তী মুক্তিনাথ নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ-নিবাসী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস। বিজয়কৃষ্ণ যখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গুরু অন্বেষণে আসেন, তখন দয়ার অবতার, সিদ্ধ রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে বিলাস বেশ পরিত্যাগ

করিয়া সন্ন্যাসী বেশে, 'গুরুলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহে ফিরিব না'—এই সঙ্কল্প করিয়া কয়েকমাস যাবৎ বাস করিয়াছিলেন ও জ্ঞান যোগ ভক্তি কর্ম্মের বহিরঙ্গ পদ্ধতি, অনুষ্ঠান সহকারে কিছু শিখিয়াখিলেন। তাঁহার সাধনের ধনকে এত করিয়াও হৃদয়-মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। অন্তর্যামী তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিয়া, গুরু-রূপে প্রকাশ পাইলেন ও তাঁহার নির্ব্বেদ, বিষাদ ও দৈন্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন অর্থাৎ আত্মসাৎ করিলেন।

সাধনার দ্বারা কোন উচ্চ অবস্থা লাভ করা, অনিমা লঘিমা গরিমাদি, অষ্টসিদ্ধি করতলগত করা, ভূত, প্রেত কিম্বা পিশাচ-সিদ্ধ হওয়া, অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া বাক্‌সিদ্ধ হওয়া, অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হওয়া—নিম্নস্তরের এইরূপ কোন জিনিষের প্রতি আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা বিজয়কৃষ্ণের ভিতর আমরা কোনও দিন দেখি নাই; মুক্তি, মোক্ষ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না—তাহাও বুঝিতে পারি। তিনি চাহিয়াছিলেন—ভগবানের কৃপা, যাহাতে করিয়া দিবসযামিনী তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সহবাস করিতে পারিবেন।

এই সহবাস আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন,—ভক্তিতত্ত্বের ইহাই সর্ব্বসাধ্যসার কথা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ ভাবের মধ্যে মধুর ভাবই অর্থাৎ কান্ত-প্রেমই মাধুর্য্যপূর্ণ। এই প্রেম হৃদয়ে উদ্গত না হইলে, তাঁহার সহিত সহবাস ইচ্ছা মনে জাগিতে পারে না। কান্তাপ্রেম সর্ব্ব-সাধ্যসার—কারণ ইহার মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই যে "শান্ত

দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।" তাই বুঝি সাড়ে তিনজন পাত্রের অন্যতম পাত্র, গৌরাঙ্গের মর্ম্মীঅন্তরঙ্গ শ্রীরামানন্দের মুখে শুনিতে পাই—

'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।'
'ময়িভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে,
দিষ্টা যদা সীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।'

এই পরিপূর্ণ প্রাপ্তি, একত্র না থাকিলে সম্ভব নয়। বিজয়কৃষ্ণ ইহাই চাহিয়াছিলেন।

দীক্ষার পর অর্থাৎ পরমহংস কর্ত্তৃক তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইবার পরমূহর্ত্তে আমরা তাঁহাকে 'ঢুলু ঢুলু' অবস্থায় দেখিতে পাই। মহাভাবের ইহাই একটি প্রধান লক্ষণ। ইহাই স্থায়ী সাত্ত্বিকী-সঞ্চারী ভাব। তাহার পর দেখিতে পাই, অবিচ্ছেদ্যভাবে একাদশ দিন অচৈতন্যভাবে থাকা—ইহাও সেই দশম দশার অন্তর্গত একটি বিশেষ দশা,—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো, মোহমৃত্যুর্দ্দশদশা॥"

এইযে ভাবে নিমগ্ন হইয়া বিজয়কৃষ্ণ—'বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ বিহ্বল' অবস্থায় একাদশদিন ছিলেন,—ইহা কি কোন অবলম্বন ভিন্ন হইতে পারে? কাহার সহিত একত্র অবিচ্ছেদ্য সহবাস করিয়া তিনি দিবসরজনী কাটাইলেন? যাহার জন্য এতদিন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সংসারধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, মাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া অকূল সাগরে

ভাসিয়াছিলেন, বুঝি প্রাণের অতি প্রিয়তম সেই বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ পাইয়া, আজ বিজয়কৃষ্ণের—

"সে রূপসায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কিবা দিয়া॥"

এই অবস্থা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দর্শনে সাক্ষাৎ সম্ভোগ ছাড়া মানুষ এইরূপ দেহাতীত চিৎ-চৈতন্যময় অবস্থা লাভ করিতে পারে না। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, উত্তানভাবে শায়িত, চেতনহারা সেই দেহ, সেই মনের কথা তুমি আমি নাগাল পাইতে পারি না। যার এই হয়, মাত্র সেই বলিতে পারে যে,—

"আমার মনের কথা শুন গো সজনী।
শ্যামবঁধূ পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবারূপে কিবাগুণে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না স্বরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে॥

এসব তখন মনের কথা, বাহিরের কিছু নয়। সেই শতকোটি চন্দ্রশীতল চিদ্ঘনরূপে, চতুঃষষ্ঠীগুণের আলম্বনে, মন প্রাণ সব বাঁধা পড়ে। সে বিলাস, সে ভঙ্গিমা, সে চাহনি দেখিয়া,— দেখা ফুরায় না, সম্ভোগ শেষ হয় না, বুঝি মনে হয়—কেন এতদিন ইহা দেখি নাই। তাই মর্ম্ম নিপীড়িয়া এই ক্রন্দন। কাঁদিবে কে? মন, আত্মা, প্রাণ কিছু বোধ নাই, নয়নে নয়ন রাখিয়া তখন কাঁদিতে হয়—জন্ম জন্মান্তরের অভাব, দুঃখ, বিরহ সব এই ক্রন্দনের ভিতর দিয়া যাঁহার নিকট প্রকাশ পায়,—

অন্তর্মিলনে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার নিকট যদি নাই থাকিতেন, তবে এগার দিন এগার রাত্রির অবিচ্ছেদ্য সংজ্ঞাহারা সেই অবস্থার কোন সার্থকতা থাকিত না।

ইহাই পরবশে থাকিয়া প্রবর্ত্তদেহের সাধনার একমাত্র নিশ্চিত লক্ষণ, যখন সাধক, সাধনার পর মুহূর্ত্তেই—

'রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা'—

এই কামনা করিয়া হৃদয়লয়ের সহিত বোধের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আপনা আপনি ভুলিয়া যায়। জগৎ, সংসার, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, চেতন, অচেতন, কোথায় তখন পড়িয়া থাকে। মহাশক্তি অন্তরে স্ফুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাই বিজয়কৃষ্ণের এই অচৈতন্য অবস্থা। বাহির হইতে আমরা এই পর্য্যন্তই বুঝিতে পারি।

ইহার ভিতর আর একটি রহস্য আছে। বিজয়কৃষ্ণের নিজের কথায় তাহা বলি—"একদিন গভীর রাত্রে বসে উপাসনা কর্‌ছি; একটু নিদ্রাবেশ হোলো। হঠাৎ দ্বারে ঘা পড়্‌ল। অম্‌নি দোর খুল্‌লাম, দেখি 'বিলকুল' মহাপ্রভুর দল; ঘরটি ভরে গেল; বিদ্যুতের মত আলো। অদ্বৈত প্রভু আমাকে বল্‌লেন—'আমি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ, অদ্বৈত আচার্য্য। ইনি নিত্যানন্দ প্রভু, আর ইনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। প্রণাম কর। ইনি তোমাকে মন্ত্র দিবেন; স্নান করে এসো। আমি তিন প্রভুকে নমস্কার করে বস্‌তে আসন দিলাম। পরে

পাতকুয়ায় গিয়ে স্নান করে এলাম। মহাপ্রভু আমাকে নাম দিলেন। আমি চেতনা-শূন্য হয়ে পড়্‌লাম। সকালবেলা ঘুম হতে উঠে সবগুলি ঘটনা পরিষ্কার মনে পড়তে লাগ্‌ল। ভাব্‌লাম—বুঝি স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু ঘরে আসন পাতা রয়েছে, আর কূয়ার পাড়ে ভিজা কাপড় আছে দেখে, সে সংশয় দূর হোলো। তখন মনে কর্‌লাম—আমি কেমন ব্রাহ্ম, তাহাই পরীক্ষা কর্‌তে কতকগুলি 'স্পিরিট' (spirit) এসেছিল। তখন ত জানি না, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। তাই ঐ নামও ধামাচাকা রইল।"

অতীতের সেই ঘটনার সহিত, বর্ত্তমানের দীক্ষার পর বিজয়-কৃষ্ণের এই এগার দিন এগার রাত্রি সমভাবে অচৈতন্য থাকার ভিতর একটি পরিস্কার সামঞ্জস্য দেখিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে—মহাপ্রভু অনুকল্পিত মন্ত্র ও দীক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, যেহেতু জন্মাবধি তাঁহার ভিতর ব্রহ্মের সহিত সহবাস করিবার একটি বলবতী ইচ্ছা নিরন্তর রহিয়াছে। তাই তিনি যে সর্ব্বসাধ্যসার পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম, গুরু প্রদত্ত মন্ত্রের ভিতর দিয়া পাইয়াছিলেন তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কথা এই দিক হইতে বোধ হয় কেহই আলোচনা করিয়া আজও দেখেন নাই, তাই তাঁহার সাধানার অন্তর্গূঢ় সত্যও আমাদের নিকট ব্যক্ত হয় নাই।

"*The spirit gives us not only a greater light of truth and vision, but the breath of a greater living ; for the spirit is not only the self of our consciousness and knowledge, but the larger self of life. To find our self and the self of things is not to go through a rarefied ether or thought into Nirvan, but to discover the whole greatest integral power of our complete existence.*"

"প্রাণে চাই শুদ্ধ শান্ত সমর্থ আনন্দ। আনন্দের ভিতর দিয়াই জ্ঞানের কর্ম্মের—সত্যের প্রকাশ। জীবনী শক্তির প্রেরণা যতই অমৃতময়, ভাগবত রসে ভরপুর হইয়া উঠে, সাধক ততই শুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে, দিব্য শক্তির পূর্ণতার মধ্যে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ও পরিশেষে মন বুদ্ধির উপরে বৃহতের—সাক্ষাৎ দৃষ্টির, সাক্ষাৎ সৃষ্টির সকল ধারা জাগ্রতে প্রকাশ করিয়া ধরে।" তাই আমরা দেখিতে পাই দীক্ষার পর মুহূর্ত্তেই বিজয়কৃষ্ণের প্রাণের মধ্যে এক ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণার ক্রমপ্রগতি, যাহার বলে তিনি দিব্য শ্রবণ লাভ করিয়া, রহস্যের সুবিপুল মণি-কোঠার অন্তর্লোকে বসিয়া একে একে কত কি শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার সার্থক সাধন-পথের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আমরা এইবার সেই গোপন কথাগুলির কিছু শুনিবার চেষ্টা করিব।

এগার দিন অচৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষার

প্রথম অধ্যায় শেষ হয়। সেই সময়, সেই হত-চৈতন্য দেহটিকে বাহিরের জগতে ফেলিয়া রাখিয়া, দেহাতীত জগতে তাঁহার মনকে পূর্ণ আত্ম-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সকলের অজ্ঞাতে, নিঃশব্দে, বিজয়কৃষ্ণকে তদীয় ইষ্টদেব সাধনা ও শিক্ষার যে নিগূঢ় তত্ত্বগুলি একে একে সহজে শিখাইতে লাগিলেন, তাহাই আমরা তাঁহার নিজের কথায় শুনিব। বহিরাঙ্গ বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরস্পরে প্রশ্ন ও উত্তরের ভিতর দিয়া ধাপে ধাপে যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন আমরাও সেখান হইতে আরম্ভ করিব।

প্রথমেই নিঃসংশয় হইবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—জীবাত্মাকে ভগবান মন্দ করিলেন কেন?

পরমহংস। মঙ্গলাকর পরমেশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য আপন ইচ্ছামত পুণ্য বা পাপের অনুগামী হইয়া থাকে।

বিজয়কৃষ্ণ। জীবাত্মা স্ত্রীপুরুষের এক কি ভিন্ন ভিন্ন?

পরমহংস। এক একটি মানুষের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা। জীবাত্মা পৃথক হইলেও, সমস্ত জীবাত্মার প্রকৃতি এক। পরমেশ্বর ইহাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতা নহে। ঈশ্বরের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্ত্রীপুরুষের যেমন শারীরিক পার্থক্য আছে, তদ্রুপ স্ত্রীপুরুষের আত্মাতে কোন ভিন্নতা আছে কিনা, তাহা আত্মদর্শী যোগীগণ বলিতে পারেন।

বিজয়কৃষ্ণ। যোগীরা কি আত্মাকে দর্শন করেন?

পরমহংস। হাঁ, যোগের এমন একটি অবস্থা আছে, যে অবস্থায় আত্মাকে দর্শন করা যায়।

বিজয়কৃষ্ণ। আত্মা নিরাকার; নিরাকারকে কিরূপে দর্শন করা যায়?

পরমহংস। পরমেশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন—জড় ও চেতন। জড়বস্তু দর্শনের জন্য শরীরে চক্ষু আছে। চেতন দর্শনের জন্য আত্মার চক্ষু আছে। যোগবলে সেই চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ। ঈশ্বরদর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশয় হয় না। কেহ বলে, তিনি সাকার, কেহ বলে, নিরাকার; তাহা প্রথমে কিরূপে স্থির করিব?

পরমহংস। শাস্ত্রে আছে, তিনি নিরাকার এবং তিনি সাকার। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তিদ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তত্তদ্‌যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু নিজে স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকার। নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ, সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন

না হয়, ততদিন তাঁহাকে সাকার, নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে, তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্ত সাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারে নাই।

ধর্ম্মজীবনের একটি জঘন্য মনোবৃত্তির সন্ধান পাইয়া, বিজয়কৃষ্ণ সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বার্থপরতা কিরূপে যায় ?

পরমহংস। স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল। সংসার অসার অনিত্য, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা ও আলোচনা এবং সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যখন বাস্তবিকই সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার ও অনিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবে, তখনই স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তীব্র জীবন্ত বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে। সাধক মাত্রেরই প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভস্মমাখা, কোপীন পরা বৈরাগ্য নহে ; স্বার্থনাশই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য হইতে সাধনে অধিকার জন্মাইবে।

বিজয়কৃষ্ণ। প্রাচীন ভারতে বৈরাগ্যের আদর্শ কিরূপ ছিল ?

পরমহংস। পূর্ব্বে লোকে যথার্থ ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িতেন ; নগরে প্রবেশ করিতেন না, বিষয়ীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না। কোন বৈরাগী একাকী নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ কি উপবেশন করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন। এখনও যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য উদাসীন, তাঁহারা ভ্রমেও বিষয় স্পর্শ করেন না। এখন দুই প্রকার বৈরাগ্য দেখা যায় ;

এক দুঃখ-বৈরাগ্য, দ্বিতীয় যথার্থ বৈরাগ্য। দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া অথবা অন্য কারণে আহার মিলিতেছে না, বিদ্যাবুদ্ধি নাই, অত্যন্ত অলস, পরিশ্রম করিতে চায় না, এইরূপ লোকেই অধিক পরিমাণে ভেক লইয়া ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এই দুই জাতিই ভিক্ষুআশ্রমে আগমন করিতেন; এখন নিয়ম নাই, শাসন নাই। নানা সম্প্রদায়, নানা দল। সকলেই আপন আপন দলবৃদ্ধির চেষ্টা করে; পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি নাই। ভারতবর্ষের সেই জীবন্ত ধর্ম্মভাব নাই। ধর্ম্মের কতকগুলি প্রণালী অথবা খোসা লইয়া লোকে ব্যস্ত রহিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণ। যাহারা গৃহী, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব দেখিয়া তাহারা কিরূপে বিচার করিবে?

পরমহংস। প্রত্যেক নরনারীকে ভক্তি করিবে। কেবল যে ভেকধারীকে ভক্তি করিবে তাহা নহে। মনুষ্য মাত্রেরই দোষগুণ আছে; মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্প হইতে কেবল মধু আহরণ করে, সেইরূপ মনুষ্যের গুণ গ্রহণ করিবে। মনুষ্যের মধ্যে যাহা পাপ দেখিবে, তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

বিজয়কৃষ্ণ। সংসারাসক্তি কাহাকে বলে?

পরমহংস। এই নশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করাকেই সংসার কহে। এই দেহকে অত্যন্ত ভালবাসা, তাহারই নাম সংসারাসক্তি। যে স্ত্রী কি পুরুষ কেবল আহার বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত, সেও সংসারাসক্ত। অনেকে মনে করে, নগর ছাড়িয়া বনে বাস

করিলেই সংসার ত্যাগ করা হইল ; ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বনে আসিয়াও আহার লইয়া, কুটীর, কৌপীন, আসন, অগ্নিকুণ্ড, কমণ্ডলু লইয়া যে ব্যস্ত, সেও সংসারাসক্ত। এই দেহ আমি নই, আমি নিরাকার জীবাত্মা।

বিজয়কৃষ্ণ। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু উপদেশ দিন।

পরমহংস। ভক্তিশাস্ত্রে আছে যে প্রথমে নিষ্ঠা পরে সাধুসঙ্গ তাহার পর ভজন। যাহা উপদেশ পাইবে, তাহা নিষ্ঠাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। নিষ্ঠাবান হইয়া সাধুসঙ্গ করিবে, সাধুর জীবন দেখিয়া সদাচার শিক্ষা করিবে এবং সদাচারী হইয়া ভজন করিবে। এইরূপ নিষ্ঠা, সৎসঙ্গ ও ভজন করিতে করিতে অন্তরে ভক্তি অঙ্কুরিত হয়। যাঁহার অন্তরে ভক্তি অঙ্কুরিত হয় তিনি ক্ষমাশীল, বৈরাগ্যযুক্ত ও অহঙ্কারশূন্য হন। ভগবানের নাম গানে তাঁহার রুচি হয়। ভগবান সর্ব্বব্যাপী, এজন্য সকল পদার্থ ও সকল প্রাণীতে তাঁহার প্রীতি জন্মে।

বিজয়কৃষ্ণ। বৈষ্ণব কে ?

পরমহংস। যিনি অনন্যভাবে ভগবান বিষ্ণুকে প্রেম করেন তিনিই বৈষ্ণব।

বিজয়কৃষ্ণ। তাঁহার রূপ কি ?

পরমহংস। তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ।

বিজয়কৃষ্ণ। প্রতিমা পূজা কেন ?

পরমহংস। পূজা দুই প্রকার, সাবলম্বন আর নিরবলম্বন। প্রতিমা, জল, স্থল, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, এইরূপ সৃষ্টবস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে পূজা, তাহাই সাবলম্বন এবং

নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন উহার কোন একটি অবলম্বন না করিলে পূজা হয় না। ব্রহ্মদর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না। সাবলম্বন পূজা সোপান, উহার কোনটীতে বদ্ধ থাকিলে, প্রকৃত অবস্থা লাভে বিলম্ব হয়।

বিজয়কৃষ্ণ। প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি ?

পরমহংস। ভক্তিভরে ভগবানের নাম কর ; সকল আশা পূর্ণ হবে। "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—এই বলিয়া অন্তঃশিক্ষায় বিজয়কৃষ্ণকে যথাযথ উপদেশ দান করিয়া, পরমহংস তদীয় প্রিয় শিষ্যকে স্বাভাবিক চেতনার বহির্ভূমিতে আনয়ন করেন।

এইরূপে এগার দিন কাটিল। কোন অচিন্তপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব জগতে তিনি ছিলেন তাহা এই ক্ষেত্র হইতে আমাদের জানিবার উপায় নাই, তবে ইহা ঠিক বুঝিতে পারি যে বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মভাবগুলি বিকসিত পদ্মের ন্যায়, রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে, ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে একটি দিব্য মানুষে পরিণত করিল।

আজ বিজয়কৃষ্ণ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া,—গুরুকৃপায় সেই দুর্দ্দর্শ এবং সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, সকল জীবের অন্তরে ও অতি সঙ্কট স্থানে অবস্থিত,—সেই পুরান পুরুষকে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া অপার আনন্দে বহির্জগতের জড় ও চেতন সকল পদার্থের ভিতর "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়"—এই বিচিত্র ভাবে বিভোর। কাহার অমৃতস্পর্শে আলোকময় জগতের বদ্ধদুয়ার খুলিয়া তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর

সম্মুখে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; আনন্দ-রূপে, অমৃতরূপে প্রকাশিত হইল,- এই চিন্তার ভিতর দিয়া আজ বাঙলার ব্রহ্মজ্ঞানী বিজয়কৃষ্ণ দিব্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ করিলেন। কারণ, যতদিন ইষ্ট দেবতার দর্শন লাভ না হয়, ততদিন হৃদয়-গ্রন্থি সমুদয় ছিন্ন ও সংশয় নষ্ট হয় না; বিশ্বাস, ভক্তি প্রেম ও পবিত্রতা স্বীয় হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না। ভাগবত বুঝি তাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—

"ভিদ্যতেহৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণিতস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে॥"

এই ইষ্টদেব দর্শন ও তাঁহার নিকট দীক্ষা ও শিক্ষালাভ— ইহাই ভারতীয় সাধনার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। ইহাকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোনদিন কোন যুগে গুহায় নিহিত ধর্ম্মের এই সুবিমল তত্ত্বরাজির সন্ধান পায় নাই, পাইতে পারে না। তাই মহাজন বাক্যে শুনিতে পাই—

"জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্যরূপে"
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥"

আজ তাই আমাদের শান্তিপুরের আজন্ম সংস্কার-অবিরোধী ব্রহ্মজ্ঞানী বিজয়কৃষ্ণের অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি রহিল না যে—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"
"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

আজ তিনি ইষ্টদেবের ভিতর দিয়া শিষ্যের নিকট আসিয়াছেন। এই শিষ্য তাঁহার চিহ্নিত ভক্ত। দীক্ষা দেওয়াই শেষ কার্য্য নয়—মন্ত্র দেওয়াই আত্মসাৎ করা নহে। শিক্ষাই হইল অধ্যাত্মজ্ঞান উন্মেষের প্রধান উপায়। এই শিক্ষা হইতেই প্রাপ্ত বস্তুর ধৃতি, স্মৃতি ও স্থিতি ; আর ইহার একমাত্র আচার্য্য,—ইষ্টরূপে তিনিই। যুগে যুগে তাঁহার ভক্তগণকে তিনি এইরূপে শিখাইয়া আসিতেছেন যে—

"জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।"

তাই সেই একাদশ দিন অবিচ্ছেদ্য ভাবে অন্তঃশিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি বিজয়কৃষ্ণকে শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অনুভব, ভক্তি ও ভক্তি-সাধন—শিক্ষা দিলেন। ইহারই নাম বুদ্ধিযোগ প্রদান। দীক্ষা শুধু দীক্ষাই থাকিয়া যায়—মন্ত্র শুধু অক্ষরই থাকিয়া যায়, যদি না তিনি ভক্তকে সুদুর্ল্লভ বুদ্ধিযোগ দান করেন। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ভূমি হইতে সবিশেষ প্রজ্ঞার ভূমিতে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে—মাত্র এই বুদ্ধিযোগ।

আজ আর বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ে অবিশ্বাস ও সংশয়ের লেশমাত্র রহিল না। পূর্ব্ব হইতে জন্মাবধি তিনি বিশুদ্ধ আধার ছিলেন। আজ ইষ্টদেবের দর্শন করিয়া প্রথম যে সত্যবস্তুটি বুদ্ধিযোগের ভিতর দিয়া পাইলেন, তাহাই ভারতীয়সাধনার নিগূঢ় কথা—"ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই ধর্ম্ম। যে হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন, সেই হৃদয়েই ধর্ম্ম বিকসিত হয়।"

সমস্ত অন্তর মথিয়া যখন সত্যের নিস্তরঙ্গদ্যুতি উদ্ভাসিয়া

উঠে ও তাহা যখন চৈতন্যময় ভূমিতে স্থির, অচঞ্চল হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই বুঝি তাহার উপর ভাস্বররূপে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্ময় সাকার প্রতিবিম্ব পড়ে—যাহা দেখিয়া, দ্রষ্টার অনুভূতি, বাক্যে প্রকাশ পাইয়া জগতে ঘোষণা করিয়া বলে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানিতস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষ মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

ভারতের প্রচীন ঋষিগণ অবাঙমানসগোচর ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ছিলেন; বাঙ্‌লার ভাবী ধর্ম্মগুরু যেন তাঁহাদের সহিত অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইয়া হৃদয়ের পরতে পরতে, অনুভূতির স্তরে স্তরে ঐ কথারই সার্থকতা সুস্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করিয়া আজ ঘোষণা করিলেন—"আমার অভাব মোচন হইয়াছে। আমি অনন্ত রাজ্যের দুয়ারে আসিয়াছি;—কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।"

ইহাই বিজয়কৃষ্ণের সাধনজীবনের প্রথম অবস্থার কথা ও ইহাই তাঁহার দীক্ষার পরমুহূর্ত্তে আত্মচৈতন্য হারাইয়া এগার দিন এগার রাত্রি দিব্য ভাবে বিভোর থাকার মর্ম্মকথা।

প্রবেশার্থী বিজয়কৃষ্ণকে এখন অনন্তের দুয়ারে রাখিয়া, এই-বার আমরা দেখিব কি ভাবে তিনি অন্তঃপুর প্রবেশের কল ও কৌশলগুলি একে একে আয়ত্ত করিয়া, ধীরে ধীরে সাধনার শেষে তাঁহার প্রিয়তমের পাশে আসিয়া আত্মহারা হইয়া বলিলেন:—

"চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরী
মহাভাব-রস-লীলা কি মাধুরী মরি মরি।"

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যা'র সেই জাগে।

গয়াসুরের পবিত্র দেহের উপর রক্ষিত বিষ্ণুপদের পূজা বুঝি আজও শেষ হয় নাই। কল্প কল্প ধরিয়া গয়াসুর বিষ্ণুপদ মস্তকে ধরিয়া আছে। গয়াসুর আজ অতীতের কথা মাত্র। জগত পবিত্র করিবার মহান কল্পনায়, তপস্যাসিদ্ধ যে অসুর একদা ব্রহ্মার বরলাভে সমর্থ হইয়াছিল—তাহারই পুণ্য প্রোজ্জ্বল স্মৃতিটুকু ভগবান সযত্নে ধরিত্রীর বক্ষে, তাহার নামে এই সিদ্ধপীঠ গড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়া লীলা করিয়াছিলেন, সত্যযুগে রামচন্দ্র বিষ্ণুতীর্থের এই ফল্গুর ধারে বসিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গকে এখানে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে ও মহাভাব প্রকটিত করিতে দেখিয়াছি। আজ আবার বিজয়কৃষ্ণকে দেখিলাম—তাঁহার সাধনজীবনের প্রথম শৈশব অতিবাহিত করিতে। ভারতের অনেক মহাত্মা এই গয়াধামে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। তাই ইহা সিদ্ধ স্থান—পুণ্যধাম। গয়ার পার্ব্বতীয় সমীরণে, অন্তঃস্রোতা ফল্গুর জলকণায়, সেই সিদ্ধপুরুষগণের শ্বাস-প্রশ্বাস আজও প্রতিধ্বনিত হইতে শোনা যায়।

১২৯০ সাল। আষাঢ় মাস। আজ এগার দিন হইল বিজয়কৃষ্ণ দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। রঘুবর বাবাজী পরমস্নেহে সেই মহাপুরুষের অচৈতন্য দেহটি রক্ষা করিতেছেন। সাধনার সুবিধা হইবে ভাবিয়া, বিল্ববৃক্ষের তলে একটি গোফা পরিস্কার করিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞান হইলে পরে, বিজয়কৃষ্ণ এই গোফার ভিতর বসিয়া নির্জ্জন সাধনে রত হইলেন।

দিনের পর দিন, তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র—শ্বাসেপ্রশ্বাসে জপ করিয়া তিনি তীব্র ভজন আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে, বিজয়কৃষ্ণ নামের অব্যর্থ শক্তিও অনুভব করিলেন। পর্ব্বত শিখর হইতে উৎক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনীর গতির ন্যায়, নাম আপনা আপনি প্রবল বেগে প্রতি শিরায় শিরায় চলিতে আরম্ভ করিল। বাহিরের দেহটির অনুপরমাণু পর্য্যন্ত সেই বেগে শিহরিয়া, সচকিয়া উঠিল,—হাত, পা, নাক, কাণ, চোখ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিত হইয়া, ভিতরের দিকে কে যেন টানিয়া লইল। কখনও বা অস্থি মজ্জামাংসে, প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যখন এই নাম ও তৎসহ গুরুপ্রদর্শিত প্রক্রিয়া চলিত, তখন হাত, পা, জানু প্রভৃতি শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থলের গ্রন্থিসকল খসিয়া পড়িত, কখনও বা অস্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত হইয়া আল্‌গা হইয়া যাইত। অধিরূঢ় মহাভাবের এই—'উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প' অবস্থা বিজয়কৃষ্ণ যে অল্পকালের মধ্যেই পাইয়াছিলেন তাহা নহে—ইহা তাঁহার সুদীর্ঘ দিনের কঠোর সাধনার ফল।

সাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান লইয়া, ইন্দ্রিয়াতীত জগতের ভাব-

বৈচিত্র্যময় সেই অদ্ভুত সাধনার তটস্থ আলোচনাতেই মাত্র আমাদের অধিকার, কারণ সেখানকার বিষয় স্থূল-দৃষ্টি ও স্থূল-জ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহিরে ; তবে তাঁহার আদর্শ সাধন-জীবনখানি সম্মুখে রাখিয়া, আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব যে কি তপস্যার ভিতর দিয়া তিনি ভাব হইতে রূপে ও রূপ হইতে ভাবে আসিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে তিনি মহাপ্রভু অনুকল্পিত পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রেম লাভ করা কি সহজ কথা ? তাহা হইলে ইহার বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন না ; শ্রীগৌরাঙ্গ 'বেহালের' বেশে নাচিয়া গাহিয়া ফিরিতেন না। সাত্ত্বিকী সাধনার যে ক্রম ও স্তর অতিক্রম করিয়া, এই অকৈতব বস্তু লাভ হয়, বিজয়কৃষ্ণের বর্ত্তমানের সাধনা—সেই ক্রম ও স্তরগুলি, এক একটী করিয়া অতিক্রম করিয়া দীক্ষা ও শক্তি লাভ সময়ে প্রথম অনুভূত মহাভাবের সেই দিব্য অবস্থায় চৈতন্যময় স্থিতি লাভ করা।

দেহের অস্থিমজ্জায়, শোণিতে বাসনা বাসা বাঁধিয়া আছে। ভোগ-প্রবৃত্তির লালসা জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গে করিয়া আমরা লইয়া আসি। দেহের দুয়ারে কামনা. কামিনীরূপে কাঁদিয়া, সম্ভোগ-ইচ্ছা মনের ভিতর সর্ব্বদাই জাগাইয়া তুলে। ইহাদের লইয়া বাহিরের সংসার। সাধনার প্রথম অবস্থায় নাম যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে ততই ইহার তেজে দেহের ইন্দ্রিয়গণ জ্বলিয়া পুড়িয়া শুদ্ধ ও নিবৃত্তি-ময়ী অবস্থা লাভ

করিতে থাকে। দুর্ব্বিসহ সেই জ্বালা নামের সহিত বাড়িয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণের সাধনজীবনে ইহা যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি ঃ—"নাম কর্‌তে কর্‌তে একটা সময় আসে যখন শরীরে ও মনে নানাপ্রকার জ্বালা হোতে থাকে। উহা সাধনারই একটা অবস্থা। এই সময় কখন কখন শরীর আগুনে পুড়্‌লে যেমন জ্বালা হয় তেমনই জ্বালা হতে থাকে। এ জ্বালা কি জ্বালা? নাম যদি করতে পার, তাহলে জ্বালা কি টের পাবে। ইহাকে যোগ-সঙ্কট বলে। প্রাচীনকালে ঋষিদের সময়ে তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। দেহ-শুদ্ধির জন্য কারো কারোকে তাঁরা তুষানলে শুদ্ধ ক'রে নিতেন। এ যুগে তা হবার যো নাই। শরীর সে প্রকার নয়; সে প্রকারের হঠযোগেরও অভ্যাস কেহ করে না। এখন মহা-পুরুষেরা কৃপা করে নামাগ্নিতে দেহ শুদ্ধ করে নেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন এই জ্বালার আরম্ভ হয়। ক্রমে নামের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হ'য়ে পড়ে যে, মনে হয়, শরীরের প্রতি অনুপরমাণু একেবারে দগ্ধ হয়ে গেল। এই নামাগ্নির জ্বালায় মানুষ তখন পাগলের মত ছুটাছুটী করে।" ইহারই নাম শাস্ত্রোক্ত পঞ্চতপা বা পাপ-পুরুষ দগ্ধ হওয়া।

বিজয়কৃষ্ণকেও এই অবস্থার ভিতর দিয়া কিরূপে আসিতে হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে নামের যাহা অন্তর্নিহিত বিদ্যুৎময়ী শক্তি তাহা এই পাপ-পুরুষ দগ্ধ হওয়াতেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। এ নাম করিতে করিতে যদি

এই রকম দুর্ব্বিসহ জ্বালা বোধ না হয় তবে বুঝিব যে বিধিমত নাম পাই নাই। বিজয়কৃষ্ণ সেই নির্জ্জন গোফায় বসিয়া কিছু-কাল সাধনা করিবার পর প্রথমে যে অবস্থায় আসিলেন তাহা তাঁহার নিজের কথায় বলি—"প্রথম প্রথম নাম খুব শুষ্কই বোধ হয়। আমাকে যখন গুরুদেব শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর্‌তে বল্‌লেন, কিছুদিন চেষ্টা করে আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হতে লাগ্‌ল। কারণ, কিছু না বুঝে শুষ্ক নাম আর কতক্ষণ করা যায়? অনেক সময়ে নাম কর্‌তে এত শুষ্কতা বোধ হ'তো যে, বৃথা নাম কর্‌ছি মনে ক'রে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হতো।"

শিষ্যের এই বিমূঢ় বিহ্বল অবস্থায় একদিন পরমহংসজী দর্শন দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৃথা বৃথা এরূপ নাম আর কর্‌তে পারি না। শুষ্ক নাম নিয়ে আর কি হবে? কিছুই তো বুঝ্‌ছি না। একটু হাসিয়া পরমহংস বলিলেন— "শুধু আমার অনুরোধ মনে করে নাম করে যাও, শুষ্ক বোধ হয় হউক, তাতে কি? বিরক্তি বোধ হলেও তাতে কোন ক্ষতি নাই। নাম করতে থাক ক্রমে সব টের পাবে।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একাগ্রচিত্তে নাম করিতে লাগিলেন। আকাশ-গঙ্গার আশ্রম হইতে বরাবর পাহাড়ে ও সেখান হইতে বিন্ধ্যাচলে নাম-সাধন করিয়া তাঁহার ছয় মাস কাটিল। অনুভূতির প্রথম শিহরণে এইবার তিনি অন্তরে পুলক বোধ করিলেন। বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার এখন দিন যায়, একাসনে থাকিয়া রাত কাটিয়া যায়।

নামের মধ্যে কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধু পাইলেন তাহা মাত্র তিনিই বুঝিলেন। জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি—সব তাঁহার সমান বোধ হইতে লাগিল। কত সময় সংশয়াপন্ন হইয়া নিদ্রিত কি জাগরিত বুঝিবার জন্য তিনি নিজ শরীরে কাঁটা ফুটাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন।

নামের ভিতর এত আকর্ষণী শক্তি থাকিতে পারে তাহা হয়ত আজকালকার দিনে আমরা সহজে বিশ্বাস করিব না, কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের তর্কনিষ্ঠ মন—ইহা বুঝিবার অধিকার নাই; তাই হরিদাস ঠাকুর স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—'তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব'। মাত্র যুক্তি ও আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সহজেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপে বিন্ধ্যাচল হইতে দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া কিছুদিন তাঁহার সাধনায় অতিবাহিত হইলে পরে পুনরায় একদিন পরম-হংসকে দ্বারভাঙ্গায় বিজয়কৃষ্ণের নিকটে আসিতে দেখি। শিষ্য গুরুর চরণে তখনকার অবস্থা নিবেদন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন—'হঠ-যোগ প্রদীপিকা' এবং 'বিচার-সাগর' এই গ্রন্থ দু'খানা একবার পড়।' গুরুদেবের কথা মত বিজয়কৃষ্ণ সেই পুস্তক পড়িলেন। দেখিলেন—ঐ গ্রন্থ দুইখানিতে যতগুলি অবস্থার কথা লিখিত ছিল, তখন সে সমস্তগুলি তাঁহার লাভ হইয়া গিয়াছে। এই সব অবস্থা যখন সাধারণ সময় আপনা হইতে প্রকাশ পাইত, তিনি সেগুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেন তাঁহার মস্তিষ্ক বুঝি বা বিকৃত হইয়া গেল।

গ্রন্থ পাঠ শেষ না হইতেই গুরুদেব আর একবার দর্শন দিলেন। অভিমানের সুরে শিষ্য বলিলেন—"আগে কেন এই পুস্তক দু'খানা আমাকে পড়্তে বলেন নাই? পরমহংস বলিলেন—"না, আগে দিলে ঠিক হতো না। ঐ গ্রন্থ তোমাকে আগে পড়ায়ে নিলে, এখন তুমি মনে করতে—ঐ পড়ার সংস্কারেই তোমার মাথার গোলমাল ঘটেছে। এ সকল অবস্থায় তোমার যথার্থ বিশ্বাস হ'তো না। এখন তোমার অবস্থা তুমি নিজে অনুভব করছ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা যে সব শাস্ত্র লিখে গেছেন, তাতেও ঐ সব অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে; এখন আমিও বল্ছি সাধনেতে ক'রে তোমার যে সব অবস্থা লাভ হয়েছে, সমস্তই সত্য। এখন ও বিষয়ে আর তোমার কোন সংশয় হবে না।"

ইহাই ছিল সে যুগের সাধনা। শাস্ত্রপাঠ করিয়া যে বোধ– তাহার স্মৃতি হয় না; সাধনা করিয়া অনুভূতির ভিতর দিয়া শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া যে বোধ জন্মে তাহাই ধ্রুব, চিরন্তন, শাশ্বত ও সত্য। তাই সত্যানুরাগী বিজয়কৃষ্ণকে সাধনার ভিতর আকণ্ঠ ডুবিয়াও দেখিতে পাই,—যেখানে সংশয়, অনুভূতি অস্পষ্ট—সেখানেও তিনি সত্যের সহজ প্রকাশ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছেন।

তাই বুঝি পরিণত জীবনে আমরা বিজয়কৃষ্ণকে বলিতে শুনি—"সৎগুরু কৃপায় সমস্তই হতে পারে; আর গুরু যখন ইচ্ছা তখনই সব ক'রে দিতে পারেন—একথা যথার্থ। কিন্তু তাতে লাভ কি? একটা বস্তুর মূল্য না জান্তে যদি তা সহজেই

লাভ হয়, তা'হলে সে জন্য যত্ন হয় না। যে বস্তুর জন্য যত অভাব বোধ, তা লাভ হলে তাতে ততই দরদ ; যে বস্তুর অভাবে যত ক্লেশ, সে বস্তুর লাভে ততই আনন্দ। গুরু হঠাৎ একটা অবস্থা দিলে তার আর মর্য্যাদা বুঝা যায় না। এই জন্য সাধন ভজন করে, যখন লোকে বুঝে একটি অবস্থা লাভ করা কত শক্ত, উহা কত দুর্ল্লভ, তখন গুরু কৃপা করে ঐ অবস্থা দেন। বস্তুর মূল্য জানিয়ে গুরু তা শিষ্যকে দেন—এইই নিয়ম।"

ইহাই ত সাধনা। পথভ্রান্তকে পথের ইঙ্গিত দেওয়াই হইল ভারতীয় সাধনার বিশেষত্ব। তাহার পর পথিক আপনা আপনি পথ চলিবে। একেবারেই তাহাকে পথের সীমান্তে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও, তাহা কোন দিনই কেহ কাহারও জন্য করেন নাই। বিজয়কৃষ্ণকেও তাই,—ইঙ্গিত পাইয়া—সেই পথে চলিতে দেখি।

এইবার তাঁহার সন্ন্যাসের কথা। বিজয়কৃষ্ণ নিজে তাহা এইরূপে বলিয়াছেন—"দীক্ষা গ্রহণের (কিছুকাল পরে) আমি সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম। পরমহংসজী বল্লেন—"এমনিত হবে না, যথাশাস্ত্র সমস্ত করতে হবে। তুমি কাশীতে চলে যাও, তোমাকে সন্ন্যাস দিতে হরিহরানন্দ সরস্বতী সেখানে আছেন।" আমি গয়া হতে হেঁটে কাশী পৌছিলাম। হরিহরানন্দ সরস্বতীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—"তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করে প্রায়শ্চিত্ত কর। পরে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর ; তারপরে সন্ন্যাস।

আমি অম্‌নি মস্তক মুণ্ডন করে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম। পরে উপবীত ধারন ক'রে ব্রহ্মচর্য্য নিলাম। তিনদিন ব্রহ্মচর্য্য করার পরেই তিনি আমাকে সন্ন্যাস দিলেন।"

সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁহার নাম ছিল অচ্যুতানন্দ। বিজয়কৃষ্ণ আজন্ম সিদ্ধ-সন্ন্যাসী; আনুষ্ঠানিকভাবে এই বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করা—তাঁহার সাধনজীবনে একটি উপলক্ষ্য মাত্র। পরবর্ত্তীকালে তাই সন্ন্যাসী হইয়াও তাঁহাকে স্ত্রীপুত্রকন্যার সহিত একত্র বাস করিতে দেখিয়া যখন ১৩০০ সালের পূর্ণকুম্ভের মেলায়, উদাসী বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মহান্তগণ, তাঁহাকে মেলা হইতে সরাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তখন, শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মাত্র,—তুলসীনলিনীঅক্ষধারী, জটাশ্মশ্রু দণ্ডকমণ্ডলুধারী, গৈরিক বসন পরিহিত, বাঙ্গালীর এই অবধূত বেশী সন্ন্যাসীটিকে চিনিয়াই বলিয়াছিলেন—"ইনি সামর্থ্যরতি ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ—তাই বিধিনিষেধের বাহিরে।"

সন্ন্যাসগ্রহণ—মাত্র বহিরঙ্গ বেশধারণ নয়। বিজয়কৃষ্ণ তাই সেদিন ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—"বীর্য্যধারন না হ'লে গৈরিক নিতে নাই। গৈরিকগ্রহণ, ভস্মলেপন, দণ্ডকমণ্ডলু ও চিম্‌টা প্রভৃতি ধারণ, এ সকলেরই একটা একটা বিশেষ অবস্থা আছে। সেই সব অবস্থা লাভ হলেই ও সব চিহ্ন ধারণ করিবার অধিকার হয়, না হলে বিড়ম্বনা হয়, অপরাধ হয়। আজ্‌কাল এসব বিষয়ে বিচার না থাকায় বিষম অনিষ্ট হচ্ছে। শাস্ত্রে আছে ভগবতীর রজঃ হতে গৈরিক হয়েছে। গৈরিক বসনকে ভগবান বস্ত্র বলে।

ভগবান নারায়ণের ঐ বসন। দেবদেবী, ঋষি মুনি, যোগী মহাপুরুষদের উহা বড়ই আদরের ও সম্মানের বস্তু। উহা গ্রহণ করে, যথার্থরূপে উহার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে ভয়ানক অপরাধ হয়। পূর্ব্বে এসব বিষয়ে দৃষ্টি ছিল, শাসন ছিল, জিনিষেরও ঠিক মর্য্যাদা ছিল। এখন বিদেশী রাজা কে শাসন করবে? তাই ফিরিওয়ালারও গৈরিক বসন পর্‌ছে। ভিতরে সমস্ত বাসনা কামনা থাক্‌তে, সাময়িক উৎসাহে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে কঠোর বৈরাগ্যের পথে চলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। সন্ন্যাস একটা কথার কথা নয় বা মত নয়; মানুষের ভিতরেরই একটা অবস্থা; ভগবানে সম্যক প্রকারে আত্মসমর্পণই—সন্ন্যাস।"

বিজয়কৃষ্ণের সন্ন্যাস গ্রহণের ইহাই ছিল মর্ম্মকথা। কথায় কথায় যাঁহারা আজকাল সংসার ছাড়িয়া, রং ছোপান বেশ লইয়া, আশ্রম গড়িয়া, সন্ন্যাসী সাজেন—তাঁহাদের জন্যই বিজয়কৃষ্ণ সন্ন্যাসের এই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন,—যাহা অনুসরণ করিয়া আমরা আত্ম-সন্ন্যাস লাভ করিতে পারিব।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর পরমহংসজী পুনরায় তাঁহাকে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে যাইয়া সাধনা করিতে বলেন। এইখানে সাধন করিবার সময় নাম হইতে পুনরায় জ্বালা বোধ করিয়া তাঁহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা, নিজে তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"এই জ্বালা আমার হ'য়েছিল। এই জ্বালায় স্থির থাক্‌তে না পেরে, সারাদিন আমি গায়ে পাত্‌লা কাদা মাখ্‌তাম। গুরুজীর দর্শন পেয়ে, তাঁকে জ্বালার কথা

বলায়, তিনি বলিলেন—এ জ্বালায়ই এত অস্থির হচ্ছ। এখন তুমি জ্বালামুখী চলে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন করলে, স্থানের প্রভাবে, এই জ্বালা আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হবে, পরে শীঘ্রই একেবারে নিবৃত্ত হয়ে যাবে।”

ইহার পর বিজয়কৃষ্ণ জ্বালামুখী আসিয়া সাধন ভজন করেন। সকল যায়গাতে ও সকল সময় তিনি একক ও নিঃসঙ্গ থাকিয়া সাধনা করিতেন। এইখানে নামের জ্বালা ও শুষ্কতার ভিতর তিনি যে পরমানন্দ অনুভব করেন, তাহার প্রচ্ছন্ন রহস্য ও সাধক-জীবনে শুষ্কতার আবশ্যকতা কেন—তাহা সোজা কথায় বিজয়কৃষ্ণ এইরূপে বলিয়া গিয়াছেন—“সাধনের সময়ে শুষ্কতা, নৈরাশ্য, জ্বালা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দুঃখের অবস্থা ভোগ করতে হয় বলেই ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নৈরাশ্য বা শুষ্কতা না এলে ধর্ম্মের আনন্দই থাক্‌ত না। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ যখন ধর্ম্মের উচ্চতম শৃঙ্গে উপনীত হয়, তখনই যথার্থ শক্তি লাভ করে।”

এই যে সাধনার প্রারম্ভে নামে জ্বালা ও শুষ্কতা বোধ—ইহাই হইল নামে রুচির অন্যতম লক্ষণ। সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকী ভাব হৃদয়ে জাগরিত না হইলে সাধারণ যোগসাধনার ভিতর এই বোধের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব বা আভাষ থাকিতে পারে না। বিজয়কৃষ্ণের সাধনার সমগ্র সত্যটুকু বুঝিতে হইলে আমাদের ভাব হইতে তত্ত্বের জগতে যাইতে হইবে, কারণ বস্তুর প্রকাশ হইলে তত্ত্বে। সত্যই হইল একমাত্র বস্তু।

জন্মাবধি বিজয়কৃষ্ণ একটি শুদ্ধসত্ত্বের আধার, অর্থাৎ সন্ধিনী-

শক্তির একটি বিকাশমূর্ত্তি। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, এই দিব্য আধারও সেইরূপ, সন্ধিনীর উৎস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া, আত্মচৈতন্য ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আপন ভাবানুযায়ী সম্ভোগ করে। এই ভাবের স্বভাব—শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

“পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরী নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।”

ইহাই বিষামৃত মিলন। নদীয়ার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে একদিন আমরা দেখিয়াছি এই নামের জ্বালায় পাগল হইয়া কাঁদিতে—

“বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখজ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন।”

অন্তরে একই সময়ে এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বিজয়-কৃষ্ণ বলিতেন—“সাধনপথে জ্বালাযন্ত্রনার ভিতর দিয়া যেতে হবে। এ সব অগ্নি পরীক্ষা, ইহাতে যত পোড়া যাবে, ততই বিশুদ্ধ হইবে। ইহা নানারূপে সাধকের প্রকৃতি ও সংস্কার অনুসারে তাহাকে অধিকার করে। জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত পাপ

দগ্ধ করতে, অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই যন্ত্রনাই মুক্তির হেতু। প্রথমে যন্ত্রনা শুকায়ে নীরস হবে। বিষয়রস একবিন্দু থাকতেও ব্রহ্মানন্দ আসে না। এই যন্ত্রনার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে।” ইহাই হইল নামে শুষ্কতা ও জ্বালা বোধ করিয়া, অত্মরতিতে বিজয়কৃষ্ণের প্রথমে নৈরাশ্য বোধ করিবার মর্ম্মকথা।

বিশুদ্ধ তত্ত্বপূর্ণ আধারেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। তখন বুঝি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সমস্তই তাহার মধ্যে লয় পাইয়া যায়। নাম-নামী অভেদ-রূপে অন্তর আলো করিয়া দেখা দেয়। সান্তের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ—অন্তর ও বাহিরে এক বিপুল বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়। ভগবত্ত্বা পরিস্ফুট ভাবে হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, ভক্তের হৃদয়ে নানাভাব ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। বাহিরের দেহ, ভাবের আবেগ স্থির ভাবে ধারণ করিতে পারে না—অনুপরমানু সহসা চঞ্চল হইয়া উঠে। যতই এই ভাব স্তরে স্তরে বাড়িতে থাকে, দেহ মন ততই শিথিল হইয়া পড়ে। বাহিরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব—যতই স্তরে স্তরে বাড়িতে থাকে অন্তরে ততই, সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী হইতে থাকে—দেহ ও মন এই নবপ্রেম সঞ্চারে কি হইয়া যায় তাহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে, কারণ—

“ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥”

ইহাই ছিল বিজয়কৃষ্ণের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী সন্ধিনী সাধনা।

সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কররে।
আদি সত্য তিনি, কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যপ্ত চরাচরে॥

১২৯২ সনের শেষ ভাগে সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ কয়িয়া, বিজয়কৃষ্ণ বাঙ্‌লায় ফিরিলেন। যদিও তিনি ইচ্ছা করিলে হিমালয়ের নিভৃত গুহায় অথবা জনমানব শূন্য গভীর জঙ্গলে সাধনজীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি আসিয়াছিলেন—সমগ্র জাতির প্রাণে ভারতীয় সাধনার রীতিনীতি গুলি, সাংসারিক সুখদুঃখের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা—তাঁহার নিজের জন্য যতখানি না হোক, তাহার বেশীর ভাগ—আমাদের জন্যই নিরূপিত ছিল।

সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পঞ্চম-পুরুষার্থ সিদ্ধ, বাংলার ভাবীগুরু দেশে ফিরিলে তাঁহাকে চিনিয়া লইবার জন্য, তখন মাত্র তিনজন মহাপুরুষ উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন,—ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর আচার্য্য কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে যেমন বিজয়কৃষ্ণের আপ্রাণ সাধনার প্রয়োজন ছিল, বিজয়কৃষ্ণের পক্ষেও তেমনি এই বিপুল ব্রাহ্মসঙ্ঘ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ব্ব হইতে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না থাকিলে, বিজয়কৃষ্ণের সাধনলব্ধ আদর্শের অনেকখানিই বাঙ্গালীর নিকট চিরদিনের মত অপ্রকাশিত হইয়া

থাকিত। রামকৃষ্ণের বিপুল সঙ্ঘে তিনি নিজ আদর্শ প্রচারের সুবিধা পাইতেন না। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তখনও পর্য্যন্ত বিধর্ম্মী বলিয়াই তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছিল। আর বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সমাজেরত কথাই নাই—সেদিনও পর্য্যন্ত তিনি ইহাদের কাছে অদ্বৈত-বংশের অখ্যাত সন্তান ছিলেন।

আজ তাই স্বদেশে ফিরিয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত সেই পুরাতন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রথম আশ্রয়-স্থল হইল। একদিকে, দক্ষিণেশ্বরের সূর্য্য তখন তাঁহার সাধনরশ্মি সংহত করিয়া অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; অন্যদিকে মহর্ষি—পরলোক চিন্তায় নিমগ্ন; আর, কেশবচন্দ্র তখন—রাহুগ্রস্ত, বিমলিন। ঠিক এই সময়, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-জীবনের বিরাট ভবিষ্যৎ,—মাত্র বিজয়কৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়া রহিল। রামকৃষ্ণ তাই তাঁহার সেই রহস্যপূর্ণ কথায়, আভাষে জাতিকে জানাইয়া দিলেন—বিজয়কৃষ্ণ কি,—"তোকে দেখে যে আমার হৃৎপদ্মটি ফুটে উঠ্‌ল।" বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের এই একটি কথার ভিতর দিয়া, জাতি সেদিন তাহার ভবিষ্যৎ ধর্ম্মগুরুকে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিল। মহর্ষি মুমূর্ষু অবস্থায় বলিয়া গেলেন—"তোমাকে নূতন মানুষ দেখিতেছি, আজ হইতে তুমি যাহা বলিবে তাহাই আমার কথা।" কেশবচন্দ্রও বিজয়কৃষ্ণের ভিতর এক দিব্য সত্ত্বার বিকাশ দেখিয়া বুঝিলেন যে—তিনিই কেবল সারাজীবন পথহারা হইয়া ঘুরিয়াছেন। বস্তুদর্শন ভিন্ন পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ-অনুভূতি হয় না। ঈশ্বর একমাত্র বস্তু। তাই ঈশ্বরদর্শন—ভারতীয় সাধনার চরম কথা। "মানুষ ভজনে কেমনে হয়, সাক্ষাৎ নহিলে কিছু নয়।"

বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার বর্ত্তমানের আদর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্মধর্ম্মকে নূতনভাবে আর একবার গড়িবেন, তাই ঢাকায় কিছুকাল থাকিয়া এই চেষ্টার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া, অসাম্প্রদায়িকভাবে নিজেই নিজের আদর্শের জন্য প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন ও সেই সঙ্গে,—'আমি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভিতরে নাই—' এই কথা ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালীকে শুনাইলেন। তাই ১২৯৩ সালের মধ্যভাগ হইতে বিজয়কৃষ্ণকে আর আমরা ব্রাহ্মসঙ্ঘে দেখিতে পাই না।

ধর্ম্মের ভিতর দিয়া জাতি গড়িবার ও ইহার লুপ্ত বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করিবার মহৎ সঙ্কল্প লইয়াই তিনি আসিয়াছিলেন। ১২৯৩ হইতে ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অনুক্ষণ পুলক, অশ্রু, ভাব, কম্প, বৈবর্ণ ইত্যাদি মহাভাবদ্যোতক সাধনার অবকাশে, লোকশিক্ষা ও লোকদীক্ষার ভিতর দিয়া তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন,—তাহাই আমাদের আলোচনার শেষ কথা।

বিজয়কৃষ্ণ ভারতের ধর্ম্মের সকল দিক দেখিয়াছেন। যেখানে যত সম্প্রদায় আছে, যত পন্থা আছে তিনি সকল দলেই গিয়াছেন ও সকল পথেই চলিয়াছেন। তাহার পর ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষী সাধনায় যতখানি পাওয়া যায়, তিনি তাহার অনেক বেশী পাইয়াছিলেন। কিন্তু—সাধনা যতই কঠোর ও উন্নত প্রণালীর হোক্ না কেন—তাঁহার কাছে ইহার মূল্য খুব কম ছিল। তিনি জানিতেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।" তাই বুঝি, সে পথে চলিবার অক্ষয় ও অব্যর্থ পাথেয় আমাদের জন্য রাখিয়া, বলিয়া গিয়াছেন যে—"ভগবানের

কৃপাই সার, আর কিছুই কিছু না। কাতর হ'য়ে তাঁর দিকে তাকালে, তিনি নিশ্চয় কৃপা করেন। সাধন ভজন শুধু জেগে থাক্‌বার জন্য, যেন তাঁর কৃপা এলে ধর্‌তে পারি। সাধন ভজন করে কার সাধ্য তাঁকে লাভ করে? সাধন ভজন করে তাঁকে লাভ করতে হয়, একথা কিছু নয়। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁর কৃপা হলেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

ইহাই ভারতীয় সাধনার নিগূঢ় মর্ম্মকথা। যুগযুগান্তের কঠোর কৃচ্ছ সাধন, তোমার ব্যর্থ হইয়া যাইবে—যদি তুমি তাঁহার অযাচিত কৃপা হইতে বঞ্চিত থাক। কৃপাবিহীন তপস্যায়—ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে, তত্ত্ববস্তু প্রকাশ পাইতে পারে না, কারণ—"স্বয়ং ভগবানই তত্ত্ব। ভগবানের ভাবের, কার্য্যের ও লীলার কি আর বিরাম আছে? তত্ত্ব অনন্ত। এ তত্ত্ব কি আর সাধনাদি করে লাভ করা যায়। লক্ষলক্ষ জন্ম কঠোর সাধন ভজনে দেহপাত কর্‌লেও এসব তত্ত্বের একটিমাত্র কেহ জান্‌তে পারে না। এসব তো আর সাধনসাপেক্ষ নয় সাধনাতীত, একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই এসব তত্ত্ববস্তু লাভ হয়। সাধনা করে লাভ করতে গেলেই অসম্ভব। তাঁর কৃপায় মুহূর্ত্তের মধ্যেও সবই হতে পারে। জীব মুক্ত হয়ে একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই লীলাতত্ত্বে প্রবেশ করতে পারে। ইহাই পরতত্ত্ব।"

জাতিকে তিনি এই কথাই বুঝিতে বলিয়া গিয়াছেন। আগে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া পশ্চাতে ধর্ম্ম সাধন—এই পরম সত্য বিজয়কৃষ্ণ জাতির জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি

অন্তর্দ্রষ্টা ছিলেন, তাই পাশ্চাত্যের ভাবধারা হইতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ভবিষ্যতে চলা যে খুব কঠিন হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায়—প্রতি কথায় কারণ খুঁজিয়া পরে কার্য্য করিব—এই উন্মার্গ-গামী বৃত্তির গতি ও পথ বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার আদর্শ সাধন-জীবনখানি বাঙ্গালীর সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন—পূজা প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য নয়, শুধু জাতিকে, আপনার ধর্ম্মটুকু বজায় রাখিয়া চলিবার সঙ্কেত দিবার জন্য। ভগবান ভরসা করিয়া চলিতে হয়—ইহাই জাতিকে আজ সর্ব্বপ্রথমে স্বীকার করিতে হইবে।

সকল দিক দিয়া ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থার মূল কারণ কি—আজ যেমন তাহা জানিতে পারিয়া, আমরা বুঝিয়াছি যে—"*The evils are really the outcome not of the orthodox Hindu creed, but a fall from that creed. It was from the time that India became apostate from the burning faith of God consciousness and God realisation that marked the India of old that her evils and miseries began. And these evils can only end, if India recovers her ancient ideals, lives her ancient culture again. Cheap, shoddy imitation of western modes of life and thought cannot recover the social evils of India, for it is the shallow, soulless mimicry that is responsible for these.*"

বিজয়কৃষ্ণও সেদিন ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই

এই অধঃপতন হইতে উঠিবার জন্য আমাদের সঙ্কেত করিয়া বলিলেন—"ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রপথ ধরে সর্ব্বদাই চল্‌তে হবে। যদি কোন সাধুবাক্য ঋষিবাক্য থেকে অন্য প্রকার হয়, তবে ঋষিবাক্যই গ্রহণ কর্‌তে হবে। যে সকল নিয়ম পদ্ধতির উপরে মনুষ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করা উচিত নয়। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র কাগজ নয়, কালী নয়, অক্ষরও নয়। উহা জীবন্ত, জাগ্রত্ত এবং স্বপ্রকাশ।"

সংসারে মানুষ প্রতিদিন যাহা ভোগ করে সেই জ্বালাময়ী অশান্তি—'কিছু নয়' বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ কোন দিন তাহাকে উপেক্ষা করেন নাই বা ইহার যন্ত্রনায় আমাদের বনে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া শান্তি খুঁজিতে উপদেশও দেন নাই। সংসারের স্বরূপ হইল—অশান্তি; এখানে কেহই সুখী হইতে পারে না। কিন্তু ইহার মধ্যে থাকিয়াই যে ভগবানকে পাইতে হইবে। তাই তাঁহার মুখে পরম আশ্বাসের কথায় শুনিতে পাই—"মানুষের সমস্ত অশান্তিই ধৈর্য্যের অভাবে। ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির একমাত্র কারণ। মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যা করবে, স্থিরভাবে বিচার ক'রে করা উচিত। হঠাৎ কোনও কাজই করা সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য্য ধ'রে কার্য্য করতে হয়। ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, ধৈর্য্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মতের অনৈক্য, অবস্থার পার্থক্য, এসমস্ত তো সংসারে চিরকালই থাকবে।"

দুঃখপূর্ণ সংসারে শান্তিতে থাকিবার এমন সহজ উপায়

তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া পাইয়াও, আমরা তাহা কার্য্যতঃ চেষ্টা করিয়া দেখি নাই বলিয়াই,—এই দুঃখ ও অশান্তি আজ আমাদের জীবন ও সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। জাতীর সর্ব্বমুখী বৃত্তিগুলি এক জীবনে সাধিয়া, যিনি—নিজের অনুভূতি ও প্রাপ্তির সর্ব্বোচ্চভূমি হইতে স্বেচ্ছায় নামিয়া আসিয়া, জাতির জন্য এমন জীবন্ত ও সহজ উপদেশগুলি রাখিয়া গেলেন—তাঁহার সম্মান ও পূজা কি মাত্র—তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করাতেই ? না,—তাঁহার জীবন-বেদের প্রতি সূত্রটি, কথায় ও কার্য্যে পরিণত করিয়া, সমগ্র জাতির মানুষ হইবার উন্নত আকাঙ্ক্ষায় ? ভারতের ভবিষ্য-জাতিই একদিন ইহার উত্তর দিবে।

জন্মের পর জ্ঞান অবধি বিজয়কৃষ্ণ দেখিয়াছেন—শান্তিপুর ও নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সময় হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণবে যেরূপ ঝগড়া হইত আজও তাহা কমে নাই। ধর্ম্ম কোথায়—তাহার ঠিকানা নাই, মতের গুরুত্ব লইয়া বিবদমান বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবন হইতে সত্যবস্তু যায় যায় ভাবিয়া, শাক্ত-বৈষ্ণবের পার্থক্য নিরুপণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ সকলকেই বলিলেন—"শাক্ত ও বৈষ্ণবের চরমে একই অবস্থা লাভ হয়। তবে পথে, উপাসনার ভাবের পার্থক্য দেখা যায় মাত্র। যাঁরা বৈষ্ণব প্রকৃতির লোক, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই চান্ না ; একান্ত প্রাণে তাঁরা দাসই হ'তে চান। ভগবদ্ভক্তি লাভ ক'রে তাঁরা অভয় পদই প্রাপ্ত হন। আর শাক্তদের অন্য প্রকার—শাক্তেরা প্রথমে ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা ক'রেই কঠোর সাধন করেন ; পরে, ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে,

পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করেন; ঐ প্রকারে সর্ব্বজীবের সেবা ক'রে ভগবদুপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ করেন। শেষ অবস্থা সকলেরই এক।" শাক্ত-বৈষ্ণবের পার্থক্য লইয়া যাহারা উন্মত্ত, তাহাদের হইয়া দুই মতেই বিজয়কৃষ্ণ সাধনা করিয়া নিঃসংশয়রূপে যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাও বাঙ্গালীকে শুনাইয়া বলিলেন—"শক্তি পূজা না ক'রে কারও কি পার পাবার যো আছে? শক্তির কৃপা না হ'লে কিছুই যে হয় না।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের মনোবৃত্তি কিরূপ সংশয়াপন্ন, তাহা বিজয়কৃষ্ণের মত কেহই প্রত্যক্ষ্যদর্শী ও ভুক্তভোগী নহে। আমরা শাস্ত্র কতক পড়ি, কতক পড়ি না; যাহাও পড়ি তাহা আবার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস লইয়া। ভগবানের মানুষী-লীলা আজও আমাদের কাছে অবিশ্বাসের জিনিষ—তাই বুঝি জীবনে তিল তিল করিয়া, অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে, সংশয় হইতে সত্যে উপনীত হইয়া, সত্যকে আবার স্বরূপে চিন্ময় মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়া,—বাংলার ধর্ম্মগুরু যে দিব্য জ্ঞান পাইয়াছিলেন, আমাদের মতিগতি ফিরাইবার জন্যই তাহা সহজ ও অকপটে বলিয়া গিয়াছেন। এখন তাহা শুধু আমাদের শুনিবার অপেক্ষা রাখে।

শাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যাঁরা শাস্ত্রের কতক অংশ গ্রহণ করেন, কতক অংশ ত্যাগ করেন, তাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, নিজের মনমত কথাই বেছে নেন মাত্র। তাঁদের আবার শাস্ত্রআলোচনা, শাস্ত্রচর্চ্চা কেন? শাস্ত্র বিশ্বাস কর্‌লে, আগাগোড়া সমস্ত শাস্ত্রই বিশ্বাস করতে হয়। একটু

ক'রে, একটু না কর্‌লে চল্‌বে কেন? কোন শাস্ত্রগ্রন্থেরই আগাগোড়া সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করে না পড়্‌লে, একটা অর্থ বোধ হয় না। শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করে না পড়্‌লে, শাস্ত্র পড়া আর না পড়া সমান।

"শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্য পথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, তাহাও যাইবে না। শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্র বিশ্বাস করিলে আর ভয় থাকে না। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র এবং ঋষিগণ যেরূপ সদাচার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই উপকার হয়। শাস্ত্রপাঠে প্রতারণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শাস্ত্র না জানিলে সমস্তই অবিশ্বাস হয়। যদি জানা থাকে তবে সত্য-অসত্য প্রভেদ করা যায়। যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা শাস্ত্রের উপদেশ।"

পশ্চিমের সর্ব্বগ্রাসী মোহ হইতে আমাদের রক্ষা করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ এই সাবধানী সঙ্কেত দিয়া গিয়াছে; এখন আমাদের মধ্যে যে চালাক হইবে সেই ইহার সন্ধান লইবে। ভারতের শাস্ত্র—তাহা ত কল্পনা মাত্র নহে, ঋষি-প্রণীত যে আনুভূতিক কথা—সে যে সত্য হইতেও সত্য। জাতিকে আজ ইহা মানিতেই হইবে। শ্রদ্ধা, অন্ধবিশ্বাস অথবা বিজয়কৃষ্ণের খাতিরে নয়,—নিজের যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত মিলাইয়া—ইহাকে গ্রহণ করিব।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম আজ জাতির জন্য প্রশস্ত নহে। দেহধর্ম্ম স্বীকার করিয়া যে ধর্ম্ম—তাহাই বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ

ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। সংসার ছাড়া যে ধর্ম্ম—অন্যের তাহা হইতে পারে, কিন্তু, আমাদের জন্য বিজয়কৃষ্ণ যাহা নিজ জীবনে আচরণ করিয়া গিয়াছেন—তাহা সংসার লইয়া। যেখানে প্রথম জন্ম গ্রহণ করি, যেখানকার মাটি প্রথমে কোলে ধরে, যেখানকার আলোবাতাস জীবনী-শক্তি বাঁচাইয়া রাখে—সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়াই আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—দুইই পালন করিতে হইবে।

সংসারকেই যে স্বর্গ করা যায়—তাহার অব্যর্থ সঙ্কেত বিজয়-কৃষ্ণের সাধনায় এই ভাবে পাই—"কাম-ক্রোধ অধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতির মধ্যে থাকিত না। কামক্রোধের অবৈধ ব্যবহারই পাপ। যাহার প্রকৃতি যেরূপ, সে তদনুরূপ কার্য্য করে। সত্ত্ব, রজ, তম, প্রকৃতির তিনটি অবস্থা। এ তিন অবস্থা যতদিন থাকিবে, তাহার সহিত সংগ্রাম হইবে। কাম-ক্রোধ যদি বৈধ ভাবে চালিত হয়, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে, তাহাতে শত শত নরহত্যা হয়, তথাপি তাহা অধর্ম্ম নহে। যতদিন কাম-ক্রোধ থাকিবে, সময়ে সময়ে মনে উদয় হইবে। মনে উদয় হইলেই অপরাধী নহে। মনে উদয় হইলে যদি নিবারণের চেষ্টা করি তাহা হইলে পাপ নহে। তাহাতে ইচ্ছা পূর্ব্বক, আনন্দসহ যোগ দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও অপরাধ নহে। যতদিন ত্রিগুণের অধীন থাকিব, ততদিন গুণ অনুসারে আমাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে। যদি তোমার ভগবানের নাম

অবলম্বন থাকে, তবে ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া, শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইতে থাকিবে। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে। মনুষ্য সমাজ যাহা পাপ-পুণ্য স্থির করিয়াছে ভগবান্ তাহার দ্বারা তাহা দেখিয়া সে ভাবে বিচার করেন না ;—তিনি মনুষ্যের হৃদয় দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন্। বাড়ী, ঘর, টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, এ সকলকে সংসার বলে না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার।”

বিজয়কৃষ্ণকে আমরা আশৈশব জাতিভেদ মানিতে দেখি নাই—ইহাই হইয়াছিল সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নিকট তাঁহার মস্ত অপরাধ, যাহার জন্য তিনি স্ব-জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন বাঙ্গালীর পরম তুর্ভাগ্য—তাই জাতির এই যুগপুরুষের মনের ভিতরের কথার সন্ধান লইবার জন্য কেহ ব্যগ্র হয় নাই। শুদ্ধি-সংস্কারের ধুয়া ধরিয়া আজ আমরা ভারতবর্ষ হইতে জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিন্তু, আসলে এই জাতিভেদ বলিতে ভারত একদিন কি বুঝিয়াছিল—তাহা আমরা আদৌ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম না।

জাতিভেদ বলিতে অন্যে যাহাই বুঝুক, বিজয়কৃষ্ণ ইহাই বুঝিতেন যে—“জাতিভেদ-প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে ত সর্ব্বত্রই রয়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুষ্যের সমাজে নয়, পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতরে আছে। এই জাতিভেদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরা। কোথাও ইহা কেহ অতিক্রম করতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে

যা়াতিভেদ এদেশে প্রচলিত রয়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও ও েশে বা ব্যবসাগত ; আবার কোথাও বা মর্য্যাদাগত বা অবস্থা-গিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ কবীল দেশেই, মনুষ্য সমাজে সকল জাতির ভিতরে আছে।

জন্য "কিন্তু ঋষিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গিয়াছেন, জীবন অন্য প্রকার, তাহা গুণগত। সত্ত্ব, রজ, তমোগুণভেদে অন জাতিভেদ তাই ঋষিরা স্বীকার করেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, এখন শূদ্রজাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শূদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি একপ্রকার আর প্রকৃতিগত জাতি অন্যপ্রকার। পরমহংস অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহই এই জাতিবুদ্ধি ত্যাগ কর্‌তে পারে না। উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বুদ্ধি থাক্‌লেই, সেখানে জাতিবুদ্ধি থাক্‌বে। হিংসা, লজ্জা, মান, অপমান, ভাল, মন্দ বুদ্ধি যতকাল আছে, মানুষ ততকাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম কর্‌তে পারে না। যারতার হাতে খেলেই জাতি-বুদ্ধি যায় না, বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হোয়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন আহার করা হয়, তার শারীরিক ও মানসিক সমস্ত ভাব, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হয়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তা দেখ্‌তে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য। এ সকল এক বিষম সমস্যা।"

ইহাই জাতিভেদের একমাত্র মর্ম্মকথা—যাহা বিজয়কৃষ্ণ আমাদের বুঝিতে ও শিখিতে দিয়া গিয়াছেন। একদিন যে হিন্দুসমাজ হইতে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, আজ আবার

সেই সমাজের মধ্যেই থাকিয়া, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে যে সত্ত তিনি প্রতি মানবকে বিলাইয়া গেলেন—তাহার মর্য্যাদা ে৷ কতটুকু রাখিল, তাহাই আজ আমরা জানিতে চাই। র

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আজ আমরা অন্ধ হইয়াছি। ভারতের ধর্ম্মের আদর্শের নিগূঢ় মর্ম্ম না জানিয়াই ইহা—"কিছু নয়" বলিয়া বৃথা অপবাদ দিয়াছি। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম যে সর্ব্ব ব্যাপক ছিল, ও ইহা তখন আমাদের সমাজ, সংসার, ম৷ স্থনিয়ন্ত্রিত করিত—তাহার অনুসন্ধান আজ কয়জন রাখে? ভারতের ধর্ম্মগুরু বিজয়কৃষ্ণ তাই আর একবার ধর্ম্মের আদর্শকে নূতন করিয়া আমাদের দেখাইয়া বলিলেন—"যাঁহারা জীবনে কোন প্রকৃত সাধুপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখনও কোন মহাত্মার সঙ্গলাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলী ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মাত্র দেখিয়া, ধার্ম্মিক লোকদর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা সাধু চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন?

"যে দেশের ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্য-লেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্ব্বিদ, ঋষিরা গণিতশাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্র, বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থাপক ও রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরাই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত, সেই দেশে যে আজ তপস্যা ও আলস্য এক কথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক,

যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাযোগীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম্ম যে একই বস্তু এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তাপসাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ, স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপিও যে দেশের আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত কত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহার নির্জ্জন সাধন পরিত্যাগ করিয়া, অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি শত সহস্র ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া দূরদূরান্তর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং বিপিমতে ধর্ম্মপিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম, পবিত্রতা, ও সত্যধর্ম্মের জ্যোতি সমুদিত, রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান ও হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয়া আমরা চীৎকার করিতেছি যে, ধর্ম্ম আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা আনিয়া দেয়।

"যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালীত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ, আমেরিকা স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই চারিটি কথার প্রতিধ্বনি এমার্স্ন, কারলাইল প্রমুখ পাশ্চাত্য মনস্বীগণের নিকট পাইয়া উনবিংশ শতাব্দী তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠভ্রাতা যীশুখৃষ্ট এবং মহম্মদ এই দুই সহস্র বৎসর

পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া, আজ যে আমরা ইংরাজদিগের যৌবনসুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও ধর্ম্মকে আলস্য মনে করিতেছি ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?”

যে বিপুল আক্ষেপ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ এই ধিক্কার দিয়া গিয়াছেন, আপনার অন্তর দিয়া যে পরম সত্যটুকু পাইয়া আমাদের শুনাইয়া গেলেন—মহাপুরুষের সেই ধিক্কারবাণীই কি আমাদের পুনরায় জাগিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

"*We, in India, must make up our minds that we cannot borrow other peoples history, and if we stifle our own we are committing suicide. When you borrow things that do not belong to your life, they only serve to crush your life.*"

জীবনব্যাপী সাধনা, অনুভূতি ও প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া বিজয়কৃষ্ণ যে সত্যবস্তুটি পাইয়াছিলেন, তাহা মাত্র তাঁহার নিজস্ব ছিল না,—তাহার ভিতর জাতির জন্য তিনি একটি বিরাট ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ছিল বিজয়কৃষ্ণের সাধনার অন্তর্গূঢ় কথা,—যাহা তিনি আপনার ভিতরই গোপনে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যেহেতু তখন এমন কেহ সন্ধানী ছিল না যে তাঁহার অন্তরের সেই পরিকল্পনাকে বাহিরে একটি রূপ ও আকার দিয়া মূর্ত্ত করিয়া তোলে।

ভবিষ্যতের সেই ইঙ্গিতের কথাগুলির আলোচনাতেই, আমরা মহাপুরুষের এই কাহিনী শেষ করিব।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ পানে চাহিয়া, বিজয়কৃষ্ণ সেদিন বুঝি সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাইলেন যে—বাঙ্গালী আজ জাতি হিসাবে ত বটেই, ধর্ম্ম হিসাবেও এত নীচে নামিয়া গিয়াছে,—যেখানে তাহার না আছে চরিত্রবল, না আছে সত্যদৃষ্টি ও না আছে তাহার নিজের বলিয়া কিছু। পাশ্চাত্যের ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ

এই দুর্ব্বল জাতিটিকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিতেছে। তাহাদের ধর্ম্ম, দর্শন, আজ আমাদের মর্ম্ম দর্শন করাইয়া দিতে ব্যগ্র; তাহাদের বিজ্ঞান, আমাদের অজ্ঞান দূর করিতে উদ্যত। পাশ্চাত্যকে সর্ব্বপ্রকারে আমাদের জ্ঞানগুরু হইতে দেখিয়া, বিজয়কৃষ্ণ জাতির প্রাণে নবচেতনার সঞ্চার করিয়া বলিলেন—"একমাত্র সত্য ও বীর্য্যরক্ষা কর্‌লেই দেশের কল্যাণ হবে। তা ব্যতীত দেশের আর কল্যাণ নাই। যে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করছে, সম্প্রতি দেশে আর সে শিক্ষা নাই। আমাদের দেশে ঋষিদের সময়ে, তাঁহারা, ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করিয়ে দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা সে প্রণালী ধ'রে হয় না।" ভবিষ্যতের ভারতকে আজ এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

ঋষিযুগে ভারতের ইহাই ছিল ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম কথা—বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা। ইহাই সংযম। এই দুইটি না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ বহুদূরে। তাই আজ বিজয়কৃষ্ণ—জাতির সম্মুখে বিস্মৃত প্রায় অতীতের সেই আদর্শ—তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য রাখিয়া গেলেন। এমন কি ইহাও জোর করিয়া বারবার বলিয়া গিয়াছেন যে ভগবানের কৃপালাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইতে হইলে, এই সত্যরক্ষা ও বীর্য্য-ধারণ ঠিকমত প্রতিপালন করিতে হইবে। নব ভারতকে তিনি এই দীক্ষাই দিয়া গিয়াছেন যে—"সর্ব্বদা সত্য প্রতিপালন করিবে। মনে যাহা যথার্থ প্রতীতি হবে—তাহাই সত্য ব'লে

গ্রহণ কর্‌বে। সত্যরক্ষা কর্‌তে হলে মিথ্যা কল্পনা, বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হয়। না হলে সত্য বলা যায় না। বীর্য্যধারণ কর্‌বে। বীর্য্যরক্ষা যদিও শারীরিক তপস্যা তথাপি ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বীর্য্যরক্ষা না হ'লে সত্য প্রতিপালন হয় না।"

তাই বিজয়কৃষ্ণের সাধনা—উন্মার্গগামী, আচার ও বিচারভ্রষ্ট জাতিকে আজ পথনির্দ্দেশ করিয়াই বলিতেছে—সংযমের অটল ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া "সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণ করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মবস্তু লাভ হইবে।" আমাদের এই ধর্ম্ম নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য জাতির মনোভাব আমাদের দিনের পর দিন গ্রাস করিতেছে। বিদেশীর সংস্পর্শে আসিয়া, আমরা কি হইতে চলিয়াছি, তাহা বুঝি সেদিন মাত্র রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও আর বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

জাতির জীবনের ভাগবত-ভিত্তি দিনের পর দিন এমনই ভাবে ধ্বসিয়া যাইতেছে যে তাহা উপর হইতে সংস্কার করিয়া রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব। জাতিকে বাঁচিতে হইলে প্রথমে চাই—পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাব হইতে নিজেকে একেবারে বিমুক্ত করিয়া রাখা; ইহার জন্যই প্রয়োজন—আত্মশক্তি ও আত্মদর্শন।

বীর্য্যধারণ ও সত্যপালনের ভিতর দিয়া জাতিকে রক্ষা করাই ছিল—বিজয়কৃষ্ণের সাধনার অন্তর্নিহিত ভবিষ্যতের একমাত্র সত্য। আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের দিনে আজ এই পরম সত্য বুঝিতে ও মানিতে হইবে। অনাগত যুগ বিপুল সংগ্রামের ইঙ্গিত করিতেছে। একদিকে—পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা, বিজ্ঞানের নাস্তিকতাপূর্ণ নবনব তথ্যে রভিতর দিয়া

ভারতের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা ঘোষণা করিতে উদ্যত, অন্যদিকে—রাষ্ট্র-শাসনের সঙ্গেসঙ্গে হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানময়ী প্রাচীন সভ্যতাটিকে পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করিবার যে বিপুল, অদৃশ্য ও নিঃশব্দ অভিযান চলিতেছে—ইহারই গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে ভবিষ্যতের ভারতকে, পাশ্চাত্য ভাবপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা অথবা পল্লবগ্রাহী অর্থনৈতিক মেধা লইয়া নয়,—আমাদের দেশেরই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ও ঋষি-অনুষ্ঠিত সদাচারের ভিতর দিয়া।

তেত্রিশকোটি প্রাণ যদি আজ অবিচলিত সত্য ও পূর্ণ বীর্য্য-মত্তার শুদ্ধ আধাররূপে গড়িয়া উঠে,—তাহাদের মধ্যেই ভারতের সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে,—তাহাদেরই প্রতি প্রাণে ভগবান জাগ্রত হইয়া উঠিবেন। জাতি আপনার প্রকৃত সত্ত্বার উপর অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার বিগত যুগের গৌরবময় অতীতকে উজ্জ্বল-রূপে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। ধর্ম্ম, সাধনা, রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষা সবই আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে। পশ্চাত্যের মোহ-রাহু-গ্রস্ত ভারতের সনাতন আদর্শের ভাস্বর-সূর্য্য উজ্জ্বল প্রভায় মুক্ত হইয়া দিকে দিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে আলোক বিতরণ করিবে।

অতীতের বিস্মৃত ভারতের মৃতস্তূপের উপর ভবিষ্যতের ভারতকে এইরূপেই গড়িয়া তুলিবার যে অমোঘ সঙ্কেত বিজয়-কৃষ্ণ আপনার দিব্য সাধনার ভিতর দিয়া আমাদের দিয়া গিয়াছেন—তাহাই বীর্য্যধারণ ও সত্যপালনের মর্ম্মকথা।

পাশ্চাত্যভাব লইয়া এখনও বসিয়া থাকিলে বিজয়কৃষ্ণের বিরাট সাধনা মাত্র বিপুল ব্যর্থতায় পরিণত হইবে। তাই

বারবার তিনি পাশ্চাত্যভাব-বিলাসী এই জাতিকে বুঝাইয়াছেন, যে—"জ্ঞান, বিজ্ঞান সবই ধর্ম্মের মধ্যে আর এই ধর্ম্মের নূতন কথা বলিতে সেই ঋষিদিগেরই শক্তি ছিল। ঋষিবাক্যই সার।"

হায়! স্বধর্ম্মাচরণভ্রষ্ট ভারত—কোথায় তোমার গৌরবময়, সেই অতীত ঋষিযুগ! বিদেশী শিক্ষায় ও তাহাদের ধর্ম্মানুকরণে জাতি যে কতখানি দিকভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহারই ইঙ্গিত করিয়া, জাতির পক্ষ হইতে পরম দুঃখ ও অনুশোচনায় বিজয়-কৃষ্ণের নিকট আনন্দমোহন বসু তাই একদিন বলিলেন—"জীবন বৃথা গেল। মনে করিতাম ধর্ম্ম হইয়াছে, এখন দেখি কিছুই হয় নাই।" বর্ত্তমান ভারত আজ এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে—কিছুই হয় নাই। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্ম দর্শন, আমাদের জাতীয় সত্ত্বা জাগরিত করিয়া তুলে নাই। অধঃপতিত জাতির এই অদৃশ্য মর্ম্ম-বেদনা—"কিছু হয় নাই—", মাত্র বিজয়কৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই জাতির পক্ষ হইতে একক সাধনা করিয়া তিনি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিজের সম্ভোগের জন্য না রাখিয়া, সকলের মধ্যেই তাহাকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন এই আশায় যে, তাঁহার সিদ্ধির অমৃত পরশে, মৃতপ্রায় এই জাতি আবার বাঁচিবে।

বিজয়কৃষ্ণের সাধনার ভিতর ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য আর একটি নিগূঢ় সত্য আছে—যাহা লইয়া জাতির পূর্ণ জীবন, পূর্ণ সত্ত্বা ও পূর্ণ ধর্ম্ম। ইহা ভারতের লক্ষ্মী—নারী। পাশ্চাত্য প্রথায় নারী-শিক্ষার ধুয়া ধরিয়া আজ আমাদের মাতাভগ্নি ও কন্যাদের সরল অন্তঃকরণে ভারতের নারী-আদর্শ বর্হিভূত ভাবের

পঙ্কিল আবর্জ্জনা যেরূপভাবে বোঝাই করিয়া দিতেছি তাহার ফলে জাতীয়জীবনে ভবিষ্যতে ইহার কিরূপ বিষ-ক্রিয়া হইবে,—তাহাও বিজয়কৃষ্ণের সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি নারীর ভিতর ভগবতীর অখণ্ড বিকাশ দেখিতেন। ভারতের নারী-মর্ম্ম বুঝিয়া, জাতিকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া, তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান কর্‌বে তত নিজে পবিত্র থাক্‌তে পারবে। যাঁকে সম্মান করি, তাঁকে কুৎসিত, দূষিতভাবে দৃষ্টি করা যায় না। বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করা যেন একটা উপহাসের বিষয়। উত্তর পশ্চিমে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান আছে। বোম্বাই, মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে নারীজাতির সম্মান অধিক, তাতেই সব বীর জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে আছে যেখানে নারীজাতির সম্ভ্রম সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ত্তমান্।"

নারীকে সম্মান দেওয়া, তাহার সম্ভ্রম রাখার উপায় তিনি এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বদাই খুব সাবধানে না থাক্‌লে চল্‌বে না। যেভাবে বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীপুরুষে মেশামেশি দেখা যাচ্ছে তা' কিছুকাল চল্‌লে শেষে বাউলদের মত ক্রমে নানাপ্রকার ব্যভিচার আমাদের ভিতরেও আরম্ভ হবে। এখন হ'তে সকলেরই খুব সাবধান হ'য়ে চলা আবশ্যক। এসব বিষয়ে শিথিল হলে বিষম অনর্থ ঘট্‌বে। স্ত্রীপুরুষ কখনও একাসনে বস্‌বে না। চুম্বক ও লোহার যেমন পরস্পরের সন্নিকটে মিলন হয়, ঠিক সেইরূপ সহস্র ভাল হ'লেও স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়া মাত্র একে অন্যের দেহকে

আকর্ষণ করবে। তোমরা ইচ্ছা না কর্‌লেও দেহের ধর্ম্মে, দেহের স্বভাবে, দেহের গুণে অন্য দেহকে যে আকর্ষণ কর্‌বে তা' তোমরা কি প্রকারে বাধা দিবে ? স্ত্রী ও পুরুষের শরীরে এমন উপাদান আছে যে তা'তে উভয় দেহ নিকটবর্ত্তি হ'লেই একে অন্যকে চা'বে—টান্‌বে। স্ত্রীলোকদেরও কখনও পুরুষদের সঙ্গে মেশা ঠিক নয়।"

ক্ষুৎকামকণ্ঠ জাতির পক্ষে অবাধ সংমিশ্রণজাত সামাজিক ব্যভিচারের স্রোত বন্ধ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। নারীর ভগবতী সত্বাকে পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্তরালে এইরূপে ক্ষুণ্ণ করিয়া, আমরা ঋষিত্ব, দেবত্ব ও মানবত্ব হইতে শক্তিহীন, বীর্য্যহীন, সত্যভ্রষ্ট কামাচারী পশুত্বে উপনীত হইয়াছি। ভবিষ্যত ভারতের মধ্যে জাতি ইহার পুনরাবর্ত্তন দেখিতে চায়। তাই মহাপুরুষ এই সহজ ইঙ্গিতটুকু আমাদের জন্য রাখিয়া শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন—"নিজেদের যাহা যথার্থ ভিত্তি, তাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।"

* * * * * *

আজ চৌত্রিশ বৎসর হইল, বাংলার ধর্ম্মগুরু, ভারতের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা—সমাধি শয়নে নিস্তব্ধ, নিষ্ক্রিয় হইয়া আছেন। তাঁহার সাধনা যুগ যুগ ধরিয়া আলোকের পথে নব নব আবর্ত্ত রচিয়া চলিবে। তাঁহার সেই সত্য-সুন্দর আদর্শ জীবন, জাতীর এক অক্ষয় সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু শেষ সমাধি-শয়ন লভিবার সময়, ভবিষ্যৎ ভারতের পানে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার মর্য্যাদা আমরা কি আজও

দিব না? তিনি ত গুরুগিরি করিতে আসেন নাই—আসিয়াছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য সত্য-বীর্য্যবান মানুষ গড়িবার সিদ্ধ সঙ্কেতগুলি বুঝাইতে। তিনি শিষ্য করিতে আসেন নাই, আসিয়াছিলেন—"শিষ্যের ভিতরে নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাঁরই সেবা পূজা করিতে।"

অন্ধগুরুবাদ-সমাচ্ছন্ন দেশে তাঁহার স্থান ও গৌরব মাত্র গুরুর আসনেই রহিয়া গেল—তাঁহার সেই সার্ব্বভৌম আদর্শ শিষ্যগণ্ডীর ভিতরই আবদ্ধ থাকিয়া গেল। মন্ত্রদীক্ষা লইতে অনেকেই সেদিন আসিয়াছিল বটে, কিন্তু এমন একজন যথার্থ মর্ম্মী ও দরদী লোক তিনি দেখিতে পান নাই, যে তাঁহার ভবিষ্য-ভারত গঠন করিবার অব্যর্থ সত্যমন্ত্রটুকু গ্রহণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। তাই বুঝি বিদায়ের কালে বিজয়কৃষ্ণ বলিয়া গেলেন—"শিক্ষা দেওয়ার মত কারোকে পেলাম না। এ পর্য্যন্ত একটি লোকও প্রস্তুত হলো না। অনেক প্রকার কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু লোক স্থির হইতেছে না।"

তিনি মাত্র ঘটস্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। জাতির মহা-জাগরণের পূজা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমাদেরই আজ এই মহাদায়ীত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দীন, দরিদ্র, পরাধীন জাতিকে বাঁচিবার সঙ্কেত দিয়া যাহা বলিয়াছেন—"সত্য যখন জাতীয় ধর্ম্ম হয় তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করে"—তাহাই সাধনা করিবার জন্য আজ আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হউক। সত্যকাম, সত্যনিষ্ঠার জীবন্ত আদর্শ বিজয়কৃষ্ণের এতবড় বহুমুখী সাধনাকে আজ বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিতে

হইবে। তিল তিল করিয়া প্রাণ দিয়া তাঁহার পরিকল্পিত ভবিষ্যৎকে রূপ ও আকার দিয়া, তাহার ভিতর সত্যের অমোঘ বীর্য্য সঞ্চার করিতে হইবে—তবেই বিজয়কৃষ্ণের সাধনা চরম সিদ্ধি লাভ করিবে। নতুবা নিত্য ফুলজল দিয়া, প্রভাতে সন্ধ্যায় আরতি করিয়া, সমাধি মন্দিরে এ বিগ্রহের স্মৃতি পূজা করিলে, তাঁহার আত্মার সুতৃপ্তি হইবে কি না সন্দেহ।

যুগ আসে, থাকে, যায়—কিন্তু তাহা একেবারে চলিয়া যায় না। যুগ-মানবের পরিকল্পনার ভিতর দিয়া, বিজয়কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া, চৌত্রিশ বৎসর আগে এই বাঙ্গালাকেই কেন্দ্র করিয়া যে অভিনব যুগটির প্রবর্ত্তন হইতে আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহা বিজয়কৃষ্ণের সাধনাকে ধরিয়া স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সত্যদ্রষ্টা সেই মহাপুরুষের তিরোভাবের পর তাঁহারই প্রাণময়ী সাধনাকে আশ্রয় করিয়া সেই যুগ—চির-যুগ ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবে ও জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

এ কথা বলিলে যদি কাহারও রাগ, দ্বেষ বা হিংসার কারণ হইতে হয় তাহা হইলেও সহস্রবার মুক্ত কণ্ঠে, প্রকাশ্য ভাবেই বলিব—বিজয়কৃষ্ণ সমগ্র জাতির ও তাঁহার জীবন-মরণ পণকরা সত্য-প্রতিষ্ঠার বিরাট সাধনা—তাহাও এই হৃত-সর্ব্বস্ব জাতির জন্যই। তাই না, আমরা আজ তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যার ভিতর দিয়াই নূতন করিয়া বুঝিতে চাই যে,—'সত্যবোধ কত ঘনীভূত, কত সত্য হইলে, তবে তোমার আমার মত একজন মানুষ জগৎ নিয়মকে পদদলিত করিয়া, আপনার সঙ্কল্পের শিরে সার্থকতার নিত্যসিদ্ধ মুকুট পরাইতে পারে। কোন সত্যভূমিতে

চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিলে আমাদিগেরই মতন একজন মানুষ দেবতাদিগেরও উপর আধিপত্য করিতে, তাঁহাদিগের অনুশাসন অবনমিত করিতে সক্ষম হয়।'

অনুমান নহে—কল্পনা নহে, সাক্ষাৎ দর্শনের ভিতর দিয়া, জাগ্রত বোধের সহিত অন্তরে সত্যের এই অচল প্রতিষ্ঠাই—ভারতের সাধনা। পরম আশ্রয়রূপে সত্যকে মর্ম্মের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখাই—এই সাধনার সার্থকতা। এ সাধনা কর্ম্মে নিশ্চেষ্টতা আনিয়া দেয় না, সংসারে অনাসক্তি জন্মাইয়া দেয় না, জগতকে মিথ্যা ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে শিখায় না। এ সত্য-প্রতিষ্ঠা কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক। বিজয়কৃষ্ণের সাধনা ভবিষ্যত ভারতের জন্য—এই ইঙ্গিতই রাখিয়া গিয়াছে।

সত্য-সিদ্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিজয়কৃষ্ণের সমগ্র জীবনখানি এইদিক হইতে এমন করিয়া বুঝিতে পারিলে সত্যই মনে হয় ইহা যেন আর কিছুই নহে—সেই ঋষিবাণীরই একটি আদর্শ প্রতীক মাত্র, যাহা একদিন এই জাতিরই তপস্যার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতকে শুনাইয়াছিল ঃ—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

সমাপ্তি